দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ১০ সংখ্যা ॥
৩ নভেম্বর - ২০১৪ ॥
১৬ কার্তিক - ১৪২১ ॥
website : www.eswastika.com

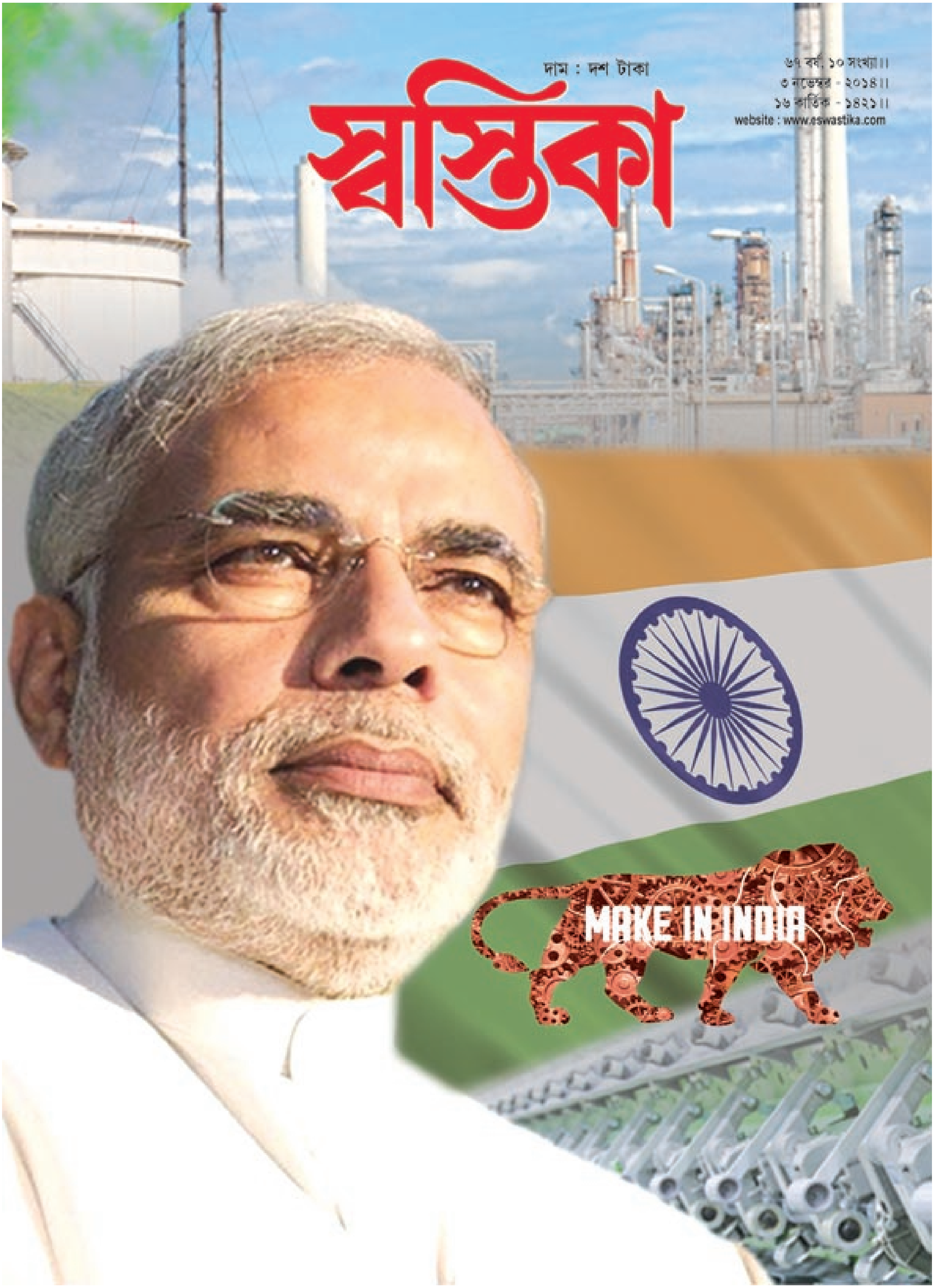

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত।।

৬৭ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১৬ কার্তিক, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

৩ নভেম্বর - ২০১৪, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

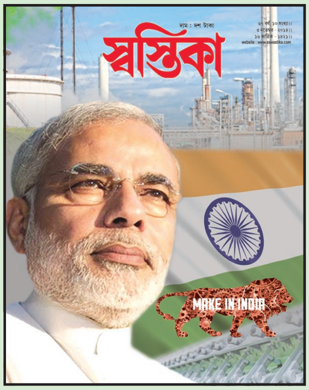

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

কেন্দ্র সরকার নয়, সুপ্রিম কোর্ট চাইলেই কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ করা যাবে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : এক মাতা-পুত্রের প্রতি ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

চৈনিক বিশ্বাসঘাতকতাকে স্মরণে না রাখলে ভারতবাসীর কপালে লাঞ্ছনা আছে ▯ দেবীপ্রসাদ রায় ▯ ১২

'মেক ইন ইন্ডিয়া' ▯ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য ▯ ১৫

ভারত গঠনে মোদীর নতুন মন্ত্র 'মেক ইন ইন্ডিয়া' ▯ অর্ণব নাগ ▯ ১৭

সদ্‌গুরু নানকদেব ▯ প্রকাশসিং অটল ▯ ২১

পৌরাণিক নগর বিদিশা ▯ গোপাল চক্রবর্তী ▯ ২২

বাংলার কয়েকজন শাক্ত-সাধক ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

ভারতে তৈরি করুন : নিবেশকারীদের প্রতি আহ্বান ▯ নিশান্ত কুমার আজাদ ▯ ২৭

খাগড়াগড়ের পর একের পর এক বিস্ফোরণ : উদ্ধার বহু বেআইনি অস্ত্র, গোলা-বারুদ ▯ ২৮

বিহার থেকে মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেআইনি অস্ত্র তৈরির রমরমা ▯ শুভাশিস রায় ▯ ২৯

স্মরণে : আমাদের অমলদা ▯ প্রদীপ ঘোষ ▯ ৩১

স্মরণে : অমলদার সান্নিধ্যে কিছুদিন ▯ ডা: শম্ভুনাথ ধাড়া ▯ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯ **অন্যরকম : ৩৩** ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫** ▯ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮** ▯ **রঙ্গম : ৩৯** ▯ **শব্দরূপ : ৪০** ▯ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বচ্ছ ভারত

মহাত্মা গান্ধী ‘স্বচ্ছ ভারত’-এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। গান্ধীজীর সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে সেই ভারত উপহার দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই হাতে ঝাড়ু ধরেছেন এবং দেশবাসীকেও এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছেন। আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ‘স্বচ্ছ ভারত’।

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

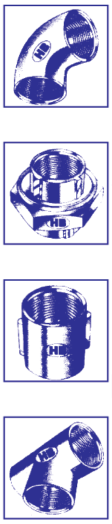

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE® PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তৃণমূলী সন্ত্রাস

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রাজত্বে মার্কসবাদী হার্মাদেরা গ্রাম দখল করিবার জন্য যে উপায়ে সমগ্র রাজত্বে সন্ত্রাস কায়েম করিয়াছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে সেই একই কৌশলে তৃণমূলী হার্মাদেরা সন্ত্রাস কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর। বস্তুত আজ তৃণমূলী সন্ত্রাসে কাঁপিতেছে গ্রামবাংলা। ভাঙড়ের পর পারুইয়ের মাকড়া গ্রামে নন্দীগ্রামেরই পুনরাবৃত্তি। বোমা গুলি বন্দুক লইয়া তৃণমূলী হার্মাদেরা মুড়িমুড়কির মতো গুলি বোমা ছুঁড়িতেছে আর বাড়িতে বাড়িতে লুঠপাট করিতেছে। বাম রাজত্বের মতোই পুলিশ শাসক দলের তল্পিবাহক। মাকড়ায় তৃণমূলী হার্মাদেরা অবাধে বোমাবাজি করিল, লুঠপাট করিল আর পুলিশের বিশাল বাহিনী তাহা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উপভোগ করিল, ইহা যেন বামরাজত্বেরই অ্যাকশন রিপ্লে। রাজ্য এখন বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একদিকে রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ও জঙ্গিদের তৎপরতা—পরিবর্তনের ইহাই নাকি ফলশ্রুতি! বামফ্রন্ট যেইখানে শেষ করিয়াছে তৃণমূল সেইখান হইতেই আরম্ভ করিয়াছে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পথেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলিতেছেন। কেবল মুখ্যমন্ত্রী বদল হইয়াছে, পতাকার রঙ বদল হইয়াছে মাত্র, কিন্তু অন্য কোনো পরিবর্তন হয় নাই। অন্য একটি বড় পরিবর্তন হইয়াছে এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা প্রায় সকলেই সিপিএমকে পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে দিদির দলে নাম লিখাইয়াছেন এবং সেই আমলের মতো ল্যাজ নাড়াইয়া দিদির অকাজ-কুকাজকে যথারীতি সমর্থন করিতেছেন।

বস্তুত, বাম রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালিকে অনেক স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন। মার্কসবাদীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ সেই স্বপ্ন দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই স্বপ্ন যে ভাঁওতা ছিল তাহা আজ মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্ন দেখাইতে পারেন, কিন্তু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিবার ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তাঁহার নাই। তাই বামরাজত্বের মার্কসবাদী অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি শুরু হইয়াছে। বামরাজত্বে রাজ্যের শিক্ষা স্বাস্থ্যের অধঃপতন ঘটিয়াছিল, এখন তাহাকে ধ্বংস করা হইতেছে। সংখ্যালঘু ভোটের লোভে রাজ্যটিকে সম্পূর্ণভাবে জঙ্গিদের হাতে তুলিয়া দিবার প্রস্তুতি চলিতেছে। রাজ্য সরকার দেশদ্রোহীদের হইয়া কাজ করিতেছে। রাজ্যের শাসক দলের নেতারা লুঠপাট করিয়া নিজেদের আখের গোছাইতে ব্যস্ত। কর্মচারীরা নিরাশায় ভুগিতেছেন। এই প্রশাসন এবং সরকার যে ভাল কিছু জনসাধারণকে দিতে পারিবে না তাহা মাত্র তিন বছরে বোঝা যাইতেছে। এই সরকারের প্রতি মানুষ বিমুখ হইয়াছেন বলিয়াই শাসক দলের অত্যাচার শুরু হইয়াছে। দলে দলে মানুষ আজ বিজেপিকে ঘিরিয়া আবর্তিত হইতেছে কেন, স্বপ্ন দেখিতেছেন কেন— তাহা বুঝিবার প্রয়োজন।

গ্রামগঞ্জে যে সমর্থন লইয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন তাহা আজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। উল্লেখ্য সংখ্যালঘু মানুষেরাও আজ বিজেপিকে সমর্থন করিতেছেন। মানুষ বুঝিতে পারিতেছেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদী ছাড়া উন্নয়ন কেহ করিতে পারিবে না। পশ্চিমবঙ্গে মা-মাটি-মানুষের নামে যাহা চলিতেছে তাহা মা-মাটি-মানুষকে শোষণ করিবার উপায় মাত্র। অত্যাচার করিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে সিপিএম মুছিয়া গিয়াছে, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নাম মানুষ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আগামীদিনে তৃণমূলেরও স্থান হইবে আবর্জনার আঁস্তাকুড়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে রাখা প্রয়োজন, মানুষের ঘুম ভাঙিয়াছে, দিন বদল হইতে বেশি সময় লাগিবে না। তাঁহার নৈতিকতা সততা যে ভণ্ডামি তাহা মানুষ আজ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

সুভাষিত

হিন্দবঃ সোদরাঃ সর্বে ন হিন্দুর্পতিতো ভবেৎ।
মম দীক্ষা হিন্দুরক্ষা মম মন্ত্রঃ সমানতা।।

সকল হিন্দু আমার ভাই, হিন্দু কোনোদিন পতিত হতে পারে না। আমার দীক্ষা হলো হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা, সমানতাই হলো আমার মন্ত্র।

ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মুখে কুলুপ এঁটেছিল কংগ্রেস

ভারতকে অশান্ত করতে ২০০৫ সালেই পরিকল্পনা করেছিল বাংলাদেশী মৌলবাদীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০৫ সালেই দেশের কংগ্রেস সরকারের কাছে খবর এসেছিল যে বাংলাদেশ থেকে মৌলবাদীরা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে। সেই পরিকল্পনাটি হলো দেশের বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠন যেমন উলফা ইত্যাদিকে বিভিন্নভাবে মদত যোগানো এবং পশ্চিমবঙ্গকে ‘লঞ্চিং প্যাড’ হিসেবে ব্যবহার করে জঙ্গি কার্যকলাপকে ভারতব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া। উইকিলিকস কেবিলে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর ও মারাত্মক তথ্য। প্রকাশিত ওই কেবিলবার্তায় যার উৎস ২০০৫-এর ১৬ ডিসেম্বর কলকাতা, তাতে মূল তথ্যের অংশত উঠে এসেছে। এই তথ্যানুযায়ী : ‘ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবহিত রয়েছেন মৌলবাদী ইসলামিক শক্তির কৌশলগত, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যাপারে। ছিদ্রময় সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে ভারতকে অশান্ত করাই ছিল তাদের পরিকল্পনা। সেই কেবিলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং)-এর এক প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর এবং পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন শীর্ষ কর্তাদের উদ্ধৃত করে জানানো হয়েছে অনামী সূত্র থেকে এরাজ্যের পুলিশ জেনেছিল যে উগ্রপন্থী সংগঠন উলফা যে অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে তা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এদেশে পাচার হয়। কেবিলে আরও বলা হয়েছে— ভারতে একবার প্রবেশ করার পর মৌলবাদীরা সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাসকারী নিজেদের সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হচ্ছে। উগ্রপন্থী আন্দোলনকে এর ফলে তারা সক্রিয় সমর্থন দিতে পারছে এবং পশ্চিমবঙ্গকে ‘লঞ্চিং প্যাড’ হিসেবে ব্যবহার করে ভারতে ও ভারতের বাইরে অবাধে যাতায়াত করতে সুবিধা পাচ্ছে।

উইকিলিকস বার্তায় এও বলা হয়েছে যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক নজরদারির মধ্যে মূলত তিনটি জঙ্গি সংগঠন পড়ছিল। যথা— জামাত-উল-মুজাহিদিন (পরবর্তীতে জামাত-উল-মুজাহিদিন, বাংলাদেশ), জাগ্রত মুসলমান জনতা এবং হরকত-উল-জেহাদী ইসলামি বা হুজি। যোগসূত্র বলছে, নিজস্ব গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিতকরণ না করে ওই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি আগে আফগানিস্তান-কেন্দ্রিক ছিল। পরে তারা বাংলাদেশ থেকেই তাদের সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালাতে শুরু করে। যেহেতু মৌলবাদী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের উৎসস্থল হিসেবে বাংলাদেশ আফগানিস্তানের চেয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক কম পরিচিত। তাতে এমনও বলা হয়েছে, নির্দিষ্টভাবে বি এস এফ কর্তৃপক্ষের কাছেই এই মৌলবাদী অসহিষ্ণুতা সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মাদ্রাসা-র মাধ্যমে যে যুবকদের জেহাদি কাজের জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে, এর একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী তারাই। ওই উইকিলিকস বার্তায় দাবি করা হয়েছে, ২০০১ থেকেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দেখছেন সীমান্তে সম্প্রদায়গত কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে। তাঁরাই বলছেন, মৌলবাদী ইসলামিক শক্তি সীমান্তবর্তী এলাকায় তার ক্ষমতাবৃদ্ধিকে কিভাবে উপভোগ করছে। যেমন, ভারত ও বাংলাদেশ উভয়পারেই মাদ্রাসা-র সংখ্যাবৃদ্ধিকে তাঁরা ‘ব্যাঙের ছাতার মতো’ বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধরনের মাদ্রাসার অধিকাংশই অনুমোদনহীন ও বলাইবাহুল্য সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন। এখানেই দেশ-বিরোধী শিক্ষা দেওয়া হয়। উইকিলিকস কেবিলে বলা হয়েছে, জনৈক সরকারি প্রতিনিধি দাবি করেছেন পাকিস্তানের আই এস আই বাংলাদেশের গোয়েন্দা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং পেট্রো-ডলার ও মাদক পাচারের টাকা দিয়ে তাদের সাহায্যও করে। কিন্তু এর সপক্ষে সেরকম জোরালো প্রমাণ হাতে এসে পৌঁছায়নি। যদিও ঘটনার সত্যতা প্রশ্নাতীত।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

সীমান্তের মাদ্রাসা-মসজিদগুলির প্রতি সতর্ক নজর রাখতে বি এস এফ-কে কেন্দ্রের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সীমা সুরক্ষা বল (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বি এস এফ) এবং সশস্ত্র সীমা বল (এস এস বি)-কে সীমান্তবর্তী মাদ্রাসা ও মসজিদগুলির দিকে সতর্ক নজর রাখার নির্দেশ দিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে গোয়েন্দা সূত্রে খবর যে বাংলাদেশ ও নেপাল সীমান্ত বরাবর মাদ্রাসা ও মসজিদগুলিতে স্থানীয় যুবকদের মৌলবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজ চলছে। সূত্রের খবর, তিনটি রাজ্য— পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশকে এই সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এহেন নির্দেশনামা অবশ্য নতুন নয়। গত জুলাইয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক বৈঠকে এইসব মসজিদ-মাদ্রাসার কার্যকলাপের দিকে নজর রাখতে বলা হয়। মন্ত্রকের এক প্রবীণ আধিকারিকের বক্তব্য, সীমান্তবর্তী মসজিদ-মাদ্রাসাগুলির মতো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কোথা থেকে কী ধরনের টাকা-পয়সা আসে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্য সরকার স্পষ্ট জানায়, এমন কোনো পদ্ধতি তাদের জানা নেই যাতে এই মসজিদ মাদ্রাসাগুলিতে বিদেশ থেকে অর্থ আসে কিনা, এবং এলে কত আসে তা জানা যেতে পারে।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে বহু অনিয়ন্ত্রিত ও অনুমোদনহীন মাদ্রাসা রয়েছে। যে কারণে এদের সম্বন্ধে অবহিত হতে ওই রাজ্যগুলি থেকে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে এও খবর যে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, মেঘালয় ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর ২৮০০টি মসজিদ ও ১৬৮০টি মাদ্রাসা রয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে সুদীর্ঘ সীমা থাকার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গে এ ধরনের মসজিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৮০০। তালিকায় এরপরেই রয়েছে অসম। এরাজ্যে মসজিদের সংখ্যা ৭৪০। বাংলাদেশ সীমা বরাবর এই দুই রাজ্যে মাদ্রাসার সংখ্যা সবমিলিয়ে ১৫০০। এইসব মসজিদ-মাদ্রাসার সিংহভাগই গত আট বছরে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বলে মন্ত্রক-সূত্রে খবর। সূত্রের আরও খবর, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং) সীমান্তের ওপার থেকে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির তহবিলের ওপর নজরদারি চালায়।

সাম্প্রতিকতম বর্ধমান বিস্ফোরণ কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) সরাসরি বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক জঙ্গি-সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিনের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে যে বর্ধমানের শিমুলিয়া মাদ্রাসায় 'নৃশংস জেহাদি আদর্শের মৌলবাদী' শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রকের এক আধিকারিকের বক্তব্য : 'গোয়েন্দা আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাজ্যস্তরীয় প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যাঁরা নিয়মিত বৈঠক করেন সীমান্ত এলাকায় কী ধরনের পরিস্থিতি রয়েছে তা নিয়ে। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারেরও সক্রিয় সহযোগিতা দরকার। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষকর্তাদের কাছে গোয়েন্দাসূত্রে খবর এসেছে যে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মাদ্রাসাগুলি মধ্যপ্রাচ্যের অর্থে পরিচালিত হয়।

এই কারণেই বি এস এফ এবং এস এস বি-কে এই ধরনের মাদ্রাসা- মসজিদগুলির কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিগত কিছুদিন ধরে এধরনের মাদ্রাসা-মসজিদের সংখ্যা না বাড়লেও এদের কাজকর্ম যথেষ্ট উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং তাঁর নেপাল সফরের সময়ও বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

ফাইল চিত্র

সংবাদ প্রতিবেদন

বিশেষ সম্পর্ক অভিযানে বিদ্বৎজনদের সঙ্গে সরসঙ্ঘচালক শ্রীভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত দিল্লীর প্রায় ৬০ জনের বেশি জ্যোতিষ্কর সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক অভিযানের মাধ্যমে মিলিত হন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন ও সংস্কৃত বিভাগের অধিকর্তারা। এছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক আমলা উপস্থিত ছিলেন।

'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং হিন্দুত্ব' বিষয়ে বলতে গিয়ে শ্রী ভাগবত বলেন, দেশের পরিবর্তনের জন্য সমাজ ও সরকারের মিলিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন আছে।

বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় গত ১২ অক্টোবর নয়া দিল্লীর পি এইচ ডি চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে। দিল্লীর সঙ্ঘচালক কুলভূষণ আহুজা এই বৈঠকের আহ্বায়ক ছিলেন। সরসঙ্ঘচালকের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এ আই আই এম এস-এর ডিরেক্টর ডাঃ এম সি মিশ্রা, ইউজিসি-র চেয়ারম্যান বেদপ্রকাশ, দিল্লী ইউনিভার্সিটির ভাইসচ্যান্সেলর দীনেশ সিং, গুরুগোবিন্দ সিং ইন্দ্রপ্রস্থ ইউনিভার্সিটির ভাইসচ্যান্সেলর অনিল কুমার ত্যাগী, অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা, কার্ডিয়াক সার্জন ডাঃ নরেশ ত্রিহান এবং ডাঃ কে কে আগরওয়াল, পর্বতারোহী সন্তোষ যাদব, নৃত্যশিল্পী সোনাল মানসিং, পূর্বতন এ আই আই এম এস ডিরেক্টর পি, বেণুগোপাল, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তোষ পণ্ডা, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন ডিজিপি প্রকাশ সিং এবং অবসরপ্রাপ্ত বেশ কিছু আমলা।

বৈঠকে শ্রীভাগবত ওই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে দেশের প্রশাসন উন্নত করার বিষয়ে নানান মতামত শোনেন। বৈঠকের শুরুতেই সরসঙ্ঘচালকের বিজয়া দশমীর ভাষণের কপি উপস্থিত সবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য সরকারের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে প্রায় সবাই নিজ নিজ পরামর্শ ব্যক্ত করেন। শ্রীভাগবত বলেন, ''সরকার সঙ্ঘের নয়, আমাদের স্বয়ংসেবকরা সরকারের মধ্যে আছে। আপনাদের পরামর্শ সরকারের কাছে পৌঁছে দিতে পারি।'' তিনি আরও বলেন, ''কোনো পরিবর্তন শুধুমাত্র সরকারের দ্বারা হতে পারে না, সরকার ও সমাজের পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিবর্তন আসে।''

সূত্রে প্রকাশ, সরসঙ্ঘচালকের সঙ্গে দিল্লীর বিদ্যৎসমাজের এই বৈঠকে উপস্থিত সবাই নিজস্ব মত জানাতে পেরে খুশি হন। সারা দেশেই এই বিশেষ সম্পর্ক অভিযান চলছে। উত্তরবঙ্গের সঙ্ঘকার্যকর্তারা সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এই অভিযান পালন করেছেন। অভিযানে তাঁরা বিপুল সাড়াও পেয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গেও এই অভিযান হবে নভেম্বরের ৮-৯ তারিখে। সমাজের বিশিষ্টদের কাছে সঙ্ঘের কার্যকর্তারা যাবেন। সঙ্ঘসূত্রের দাবি— এগুলি সবই পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি। জাতীয় গুরুত্বের কথা ভেবে প্রতি বছরই এরকম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

A

Well

Wisher

(20)

দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত করতে ১২০ কোটি টাকার সামরিক উৎপাদনে সম্মতি মোদী সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সশস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে সম্প্রতি দু' দফায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার নানান সামরিক উপকরণ, অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণের দাবিকে মান্যতা দিয়ে মেক ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ দেশেই উৎপন্ন হতে পারে— এমন বিবিধ প্রচেষ্টা শুরু করে দিল কেন্দ্রের মোদী সরকার। সংবাদে প্রকাশ, এর মধ্যে প্রথমেই ৫০ হাজার কোটি টাকায় ৬টি অত্যাধুনিক সাবমেরিন যা একাধারে স্থলভূমির ওপর দূরসঞ্চারী ক্ষেপণাস্ত্র ও আকাশ যুদ্ধের মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারবে তার কাজ শুরু করার সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে সম্পূর্ণ যুদ্ধোপযোগী থাকার দীর্ঘকালীন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন এই ডুবো জাহাজগুলি। সব চেয়ে বড় কথা হলো--- এই সাবমেরিনগুলি ভারতীয় শিপ ইয়ার্ডেই বিদেশি সহযোগিতায় নির্মিত হবে। আনুমানিক সময়সীমা প্রায় ১০ বছর।

এছাড়াও জলযুদ্ধের ক্ষেত্রে দু'টি 'মিডজেট সাবমেরিন' বা ভারতীয় পরিভাষায় যাকে 'রথ' আখ্যা দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি মেরিন কম্যান্ডোদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে। এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২০১৭ কোটি টাকা। সদ্য সমাপ্ত ডিফেন্স অ্যাকুজিশন কাউন্সিলের (ডি এ সি) মিটিং-এ সামরিক বাহিনীর দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় জল, স্থল ও বায়ুসেনাকে পূর্ণ সশস্ত্রীকরণের দিকে যথাযথভাবে এগিয়ে দিতে সরকার অতি দ্রুত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ডি এ সি'র সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী অরুণ জেটলি উপরিউক্ত প্রকল্পগুলি ছাড়াও অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিশাইল (এ টি জি এম) নির্মাণের ক্ষেত্রে ৩২০০ কোটি টাকায় ইজরায়েল সরকারের সঙ্গে চুক্তির উল্লেখ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ৩২১টি লঞ্চার ও ৮৩৫৬টি মিশাইল নির্মাণ ছাড়াও বৃহৎ আকারে দেশের মাটিতে তৈরি করার উদ্দেশে প্রতিরক্ষামন্ত্রক আরও প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা ক্ষেপণাস্ত্র নির্বাচনে সরকার আমেরিকার 'Tavelin'-কে নাকচ করে ইজরায়েলের 'spike'-কে বেছে নিয়েছে। ইজরায়েলের এই অস্ত্রটি গত বছর থেকেই সেনাবাহিনী ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছে। সরকারের কাজকর্মের এই রূপরেখা ঘোষণা করার পাশাপাশি প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সর্বাগ্রে। এক্ষেত্রে কোনো ঢিলেমি করা যায় না। অস্ত্রের সংগ্রহ ও উৎপাদন উভয়ক্ষেত্রেই যে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তি ঝটতি কাটিয়ে উঠতে হবে। গয়ং গচ্ছ মনোভাবের কোনো স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে জেটলি পরিতাপের সঙ্গে জানান যে বিগত ২০০৭ সাল থেকে ভারতীয় নৌ-বাহিনী আদ্যিকালের ডিজেল-ইলেকট্রিক চালিত সাবমেরিনের জায়গায় নতুন সর্বাধুনিক প্রযুক্তির পূর্বে উল্লিখিত জল স্থল ও আকাশ আক্রমণের মোকাবিলায় সক্ষম ৬টি সাবমেরিনের ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন আদায় করলেও এ ব্যাপারে পূর্বতন সরকারের পক্ষে টালবাহানা ছাড়া কিছুই করা হয়নি।

সংবাদসূত্রে প্রকাশ, দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ৬টির জায়গায় মাত্র ২টি সাবমেরিন আমদানি করার ক্ষেত্রেও বিগত সরকার ৭ বছর ধরে টেন্ডার ডাকতেই পারেনি। চুক্তি অনুযায়ী সই হয়ে যাওয়ার পরেও এই বিপুলাকার সাবমেরিন তৈরি হয়ে বেরোতেই ৭ থেকে ৮ বছর লাগবে।

ডি এ সি-র সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যেই তারা সরকারি ও বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই যে জাহাজ নির্মাণের কারখানাগুলি বর্তমানে রয়েছে সেখানেই প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আপ্তবাক্য মেনে এই বিশাল প্রকল্প রূপায়ণের স্থান নির্দিষ্ট করবে। Request for proposal (RFP) সেই মনোনীত জাহাজ নির্মাণ সংস্থাকেই দিতে বলা হবে যাদের সঙ্গে বিদেশি উদ্যোগের সংশ্লিষ্ট কোম্পানি তাদের সম্ভাব্য বরাত (bid) জমা দেবে।

এই সূত্রে সবচেয়ে আশার কথা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের পি এস ইউ (পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং) Mazagon Dock ইতিমধ্যেই ফারাসি যৌথ উদ্যোগে 'Scorpene submarine' নির্মাণে হাত পাকিয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারি L & T shipyard দেশের প্রথম পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন তৈরিতে লিপ্ত আছে। ফলে এই দুই সংস্থারই এই বিরাট প্রকল্পের বরাত পাওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের তুলনায় উজ্জ্বল।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ১৮৫০ কোটি টাকার ১২টি জলপথে পাহারাদার উড়োজাহাজ, ১৪৩৬ কোটি টাকার রাশিয়ান Uran missiles, ৭৪০ কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম বহন উপযোগী ১৭৬৮টি রেল ওয়াগনের উৎপাদনও শুরু হতে চলেছে। দেশের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের যোজনা 'মেক ইন ইন্ডিয়া' হয়ত অচিরেই তার প্রথম উড়ান শুরু করতে চলেছে।

কেন্দ্র সরকার নয়, সুপ্রিম কোর্ট চাইলেই কালো টাকার মালিকদের নাম প্রকাশ করা যাবে

সম্প্রতি খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে মোদী সরকার চায় না যে বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ভারতীয়দের কালো টাকা খুঁজে বার করতে। অভিযোগের তির যদিও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির বিরুদ্ধে। কিন্তু মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের কথা মাথায় রাখলে দায় সামগ্রিকভাবে মোদী সরকারকেই নিতে হচ্ছে। প্রখ্যাত আইনজীবী রাম জেঠমালানী বলেছেন, 'আমার গভীর সন্দেহ যে অর্থমন্ত্রী চান না সত্য প্রকাশিত হোক।' অথচ লোকসভার নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র মোদীজী কালো টাকা উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কী অর্থমন্ত্রী জেটলি মোদীজীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাইছেন। খবরের কাগজে প্রকাশিত সংবাদ এমনই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এই ইস্যুতে তৃণমূল সাংসদরা কোমর বেঁধে বিজেপি বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন।

একটা কথা গোড়াতেই বলা ভাল যে খবরের কাগজের প্রকাশিত সংবাদ অর্ধ সত্য। এবং অর্ধ সত্য মিথ্যার থেকেও ভয়ঙ্কর। মনে রাখতে হবে দেশের জাতীয় সংবাদমাধ্যম আজও কম্যুনিস্টদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতীয় সংবাদমাধ্যম বিজেপি-কে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল বলেই মনে করে। সত্য সংবাদটি হচ্ছে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশি ব্যাঙ্কে কালো টাকা রেখেছেন এমন ব্যক্তিদের নামের তালিকা এবং গচ্ছিত কালো টাকার অঙ্ক সরকার প্রথমে সুপ্রিম কোর্টকে জানাবে। সরকার নামের তালিকা প্রকাশ করতে পারবে না। কারণ এটাই সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ। একমাত্র আদালত চাইলে সংবাদমাধ্যম মামলার শুনানি চলাকালে ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতে পারে। জেটলি গত ২৫ অক্টোবর, শনিবার তাঁর ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, 'কালো টাকার উদ্ধারে তদন্ত জোর কদমে চলছে। কালো টাকার সঠিক অঙ্ক জানা যায়নি। তদন্ত রিপোর্ট পেলেই সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হবে। সরাসরি সংবাদমাধ্যমকে তদন্ত রিপোর্ট দেওয়ার উপর আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে। কারণ এই নিয়ে মামলা চলছে।'

যেহেতু বিষয়টি নিয়ে বিরোধীরা অযথা জলঘোলা করছেন তাই এই মামলা এবং বিতর্কটি নিয়ে পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। রাম জেঠমালানী ২০০৯ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট মামলা (কেস নং ১৭৬) দায়ের করে

গূঢ়পুরুষের
কলম

কালো টাকার উদ্ধারে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ চান। এরপর ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে আদালত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে কালো টাকার তথ্যানুসন্ধান করতে বলে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার সর্বোচ্চ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও তদন্তে আগ্রহ দেখায় না। বাধ্য হয়ে সুপ্রিম কোর্ট ২০১১ সালের জুলাই মাসে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জীবন রেড্ডির নেতৃত্বে একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করে নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের কালো টাকা উদ্ধারের কাজে নজরদারি করতে। সুপ্রিম কোর্টের ডিভিসন বেঞ্চের দুই বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডি এবং বিচারপতি এস এস নির্ঝর মন্তব্য করেন, (মনমোহন সিং এর) 'কেন্দ্রীয় সরকার কোনো দুর্বলতার জন্য বিদেশি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা উদ্ধারে রাজি নয়।' নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১২ সালের মে মাসে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানান যে সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার লুকিয়ে রাখা আছে। প্রণববাবুর দেওয়া তথ্য অসত্য বলে বিজেপি খারিজ করে দেয়। বিজেপির পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে এর আগে ২০১২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সিবিআই অধিকর্তা এ পি সিং ইন্টারপোল গ্লোবাল সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, কমপক্ষে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কালো টাকা সুইস ব্যাঙ্কে লুকানো আছে। এই কালো টাকার মালিক কারা সে কথা সরাসরি না বলে এ পি সিং মন্তব্য করেন, 'যথা রাজা তথা প্রজা।' অর্থাৎ রাজা যদি অসৎ হয় তবে প্রজারাও অসৎ হবে।

বিদেশি ব্যাঙ্কে গোপনে গচ্ছিত রাখা কালো টাকা উদ্ধারে দেশে সবচেয়ে বড় গণআন্দোলন সংগঠিত করেন যোগগুরু বাবা রামদেব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারত স্বাভিমান' শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র লীলাভূমি দ্বারকা থেকে কালো টাকার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে যাত্রা শুরু করেন। প্রথম পর্যায়ে এই যাত্রা শুরু হয় ২ সেপ্টেম্বর, ২০১০ সালে। দেশের মোট ২৫টি রাজ্যের মানুষ এই যাত্রায় যোগ দেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঝাঁসি থেকে যাত্রা শুরু হয় এবং ৩০ জানুয়ারি, ২০১১ সালে কয়েক কোটি মানুষের স্বাক্ষর করা স্মারকলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতির কাছে। বাবা রামদেবের গণআন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ২০১১ সালের জুন মাসে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এই কমিটি তার সুপারিশে বলে যে বর্তমানে চালু প্রিভেনসন অব করাপসন আইনটি সংশোধন করে কালো টাকার কারবারিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠনের কথাও বলা হয়। বলাবাহুল্য যে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার এই সুপারিশ মানেনি। কংগ্রেসের পাপ বিজেপি-র মাথায় চাপানোর যে অপচেষ্টা তৃণমূল কংগ্রেস করছে তাতে লাভ হবে না। কারণ, মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা কোনোদিনই সফল হয়নি। এবারেও হবে না। মানুষ বিজেপি-র স্বচ্ছতার উপর ভরসা রেখেছেন। তবে কালো টাকার হদিশ পাওয়াটা সহজ নয়। বিশ্বের মাত্র ১৩টি ছোট ছোট রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের ট্যাক্স ইনফরমেসন এক্সচেঞ্জ এগ্রিমেন্ট আছে। এর বাইরের অন্যান্য দেশের ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক তার আমানতকারীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ভারত সরকারকে দিতে বাধ্য নয়। তবে হাল ছাড়লে চলবে না। হয়তো সময় লাগবে। কিন্তু কালো টাকা উদ্ধার অভিযানে মোদী সরকার অবশ্যই সফল হবে।

এক মাতা-পুত্রের প্রতি

মাননীয় সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি
কংগ্রেস ভাগ্য বিধাতা
১০ নম্বর জনপথ, নয়াদিল্লী
মাননীয় রানিমা এবং যুবরাজ,

সম্বোধনে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছেন। পরিচয়েও যে আপনারা খুশি তাতো আমি নিশ্চিত। তবে একসঙ্গে দু'জনকেই চিঠি লিখছি বলে প্লিজ কিছু মনে করবেন না। আসলে এমন একটা বিষয়ে চিঠি লিখছি যে সেটা দু'জনকেই জানানো দরকার। আর আলাদা আলাদা করে একই চিঠি একই ঠিকনায় পাঠানোর কী মানে হয় বলুন?

এই চিঠি লেখার জন্য আমাকে বাধ্য করেছেন আপনাদের একান্ত বশংবদ পি চিদম্বরম স্যর। আপনাদের দয়াতেই অর্থমন্ত্রক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মতো চেয়ারে আলো করে বসেছেন তিনি। এখনও তিনি আপনাদের সমীহ করেন। তবু তাঁর গলায় ইদানীং যে সুর শুনলাম তা তো বিশ্বাস করতে পারছি না মাননীয় ম্যাডাম এবং যুবরাজ স্যর।

তিনি বলেছেন, 'আমাদের প্রজন্মে সোনিয়া গান্ধীই সব থেকে গ্রহণযোগ্য নেত্রী। নতুন প্রজন্মের মধ্যে রাহুল গান্ধীরও গ্রহণযোগ্যতা আছে। তবে তার মানে এই নয় যে ভবিষ্যতে আর কোনো নেতার উত্থান ঘটবে না।' হঠাৎ করে এমন বক্তব্য নয়। কংগ্রেস সভানেত্রী পদে আগামী বছরেই ম্যাডামের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তার ঠিক আগে আগে নেহরু-গান্ধী পরিবারের বাইরের কারও দলের সর্বোচ্চ পদে বসার সম্ভাবনার কথা বলা মানে তো রীতিমতো চ্যালেঞ্জ জানানো। কংগ্রেসের প্রধান কে হবে সেটা আপনারা ছাড়া কে আবার ঠিক করবে? কার অধিকার আছে? আপনি যদি বলেন থেকে যাবেন কার কত সাহস উল্টো কথা বলে? একান্তই শারীরিক কারণে আপনার ইচ্ছা না হলে রাহুল তো আছেন। এমনকী চিদম্বরম বলে কিনা রাহুলের বদলে সচিন পাইলটের মতো তরুণ নেতা আছে। ভাবা যায়। কার সঙ্গে কার তুলনা? এতো একেবারে ইয়ের সঙ্গে ইসের তুলনা। মোগল সাম্রাজ্যেও পাঁচটি প্রজন্ম টানা ক্ষমতায় ছিল। সুতরাং এখনও অনেক বাকি।

তবে আমার মনে একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আপনারাই পারবেন তার ঠিকঠাক উত্তর দিতে। কংগ্রেস দলের বয়স প্রায় একশ ত্রিশ বছর। ভারতের রাজনীতিতে অনেক সঙ্কট, অনেক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে গেছে আপনাদের দল। কিন্তু এমন এলেবেলে অতীতে কখনও হয়েছে কি? লোকসভা নির্বাচন তো বটেই তার আগে দিল্লী কিংবা কয়েকটা রাজ্যের ভোট সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভার সদ্য যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে একটা প্রশ্ন আসেই, আর কত হারবেন? মাতা-পুত্র জুটি এবার কি দেখাবেন?

এখন থেকেই দলের মধ্যে নেতৃত্ব বদলের দাবি উঠতে শুরু করেছে। কেউ কেউ আবার গান্ধী পরিবারের বশ্যতাহীন সময় কেমন হবে সে কল্পনায় পরিত্রাণের আশায় প্রিয়াঙ্কাকে যুবরানী বানানোর আশায় দিন গুনছেন। এরপর হয়তো গান্ধী পরিবারের বদলে জামাই রবার্টকে আঁকড়েও কেউ কেউ ভাসতে চাইবেন। কিন্তু শুধু নেতৃত্ব থেকে মাতা-পুত্রকে সরালেই কি কংগ্রেসের ভরাডুবির রেখাচিত্র উল্টোদিকে যাবে? তা তো মনে হয় না। কারণ যেসব রাজ্যে গান্ধী পরিবার তথা হাইকমান্ডের প্রত্যক্ষ নির্দেশে দল চলে না সেখানেও কংগ্রেস ডুবন্ত। আসলে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহ জুটি যেভাবে ভারতের নতুন ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন তাতে কারওরই নিস্তার নেই বলে মনে হয়। এই রাজ্যেই দেখুন। বিজেপির শক্তি বলতে দু'টি লোকসভা কেন্দ্র আর একটি সদ্য উপনির্বাচনে জেতা বিধানসভা কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কে? বিজেপি। সূর্যকান্ত মিশ্র কিংবা অধীর চৌধুরীদের তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিজেপির বক্তব্য।

সুতরাং কংগ্রেসের দিন গেছে। এখন রানিমা সরে যাওয়াই ভালো। যুবরাজ আপনিও বিদেশ-টিদেশ ঘুরুন। প্রিয়াঙ্কা মন দিয়ে সংসার করুক। ডুবন্ত জাহাজের নাবিক হওয়ার দরকার কি? আর এতেই হয় তো দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দলটা জীবনীশক্তি ফিরে পাবে। গান্ধী পরিবারের প্যারাম্বুলেটর থেকে নেমে নিজের পায়ে হাঁটতে শিখবে কংগ্রেস।

— **সুন্দর মৌলিক**

চৈনিক বিশ্বাসঘাতকতাকে স্মরণে না রাখলে ভারতবাসীর কপালে লাঞ্ছনা আছে

দেবীপ্রসাদ রায়

জাতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র মুলায়ম সিং যাদব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় চীনকে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীকে সাবধান করেছেন। ইতিহাস তাঁকেই সমর্থন করে। চীন বরাবরই আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে এসেছে এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রে সে বরাবরই জার্মানির একদা সর্বেসর্বা বিসমার্কের নীতি অনুসরণ করেছে— "Schle everything by discussions but keep a million bayonets behind." এরই জোরে সে হিমালয়ের, যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত প্রাকৃতিক সীমা লঙ্ঘন করে তার সীমাকে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে আরো ঢুকতে চাইছে। চীনা প্রেসিডেন্ট জিং জিনজিং-এর ভারত ভ্রমণের সময় চুক্তি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই চীনা সৈন্যের লাডাকের অভ্যন্তরে ঢুকে ক্যাম্প করে থাকা, ভারতীয় পরিকাঠামো নির্মাণকারীদের বাধা দেওয়ার মাধ্যমে চীন তার দীর্ঘকাল ধরে চুক্তি ভঙ্গকারী ভূমিকাকেই স্পষ্ট করে দিয়েছে।

একবার অতীত থেকেই তিব্বত সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিরাজিত ছিল। চীন রাজশক্তিও একসময় পরাভূত হয়েছিল। তিব্বতের সেই বিজয়ের ফলক এই সেদিন অবধি ছিল 'পোতাকা' প্রাসাদের সামনে— এখন কী অবস্থায় আছে তা জানা নেই। বৃটিশ সরকার একতরফাভাবে তার বাণিজ্যিক এবং সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার কৌশলগত কারণে বৃহৎ চীন দেশের অধীনস্থ এক সীমিত সার্বভৌমত্ব সম্পন্ন দেশ হিসেবে তিব্বতকে বিবেচনা করত। তিব্বতীয় জনগণের মতামত— নিরপেক্ষভাবে, কার্যত, অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিব্বত স্বাধীনই ছিল। ১৯১৩ সালে আন্তর্জাতিক অবস্থা সচেতন বৃটিশ সরকার তার বাণিজ্যিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত ও দীর্ঘস্থায়ী করতে তিব্বতের সঙ্গে এক চুক্তি করার সময় চীনকেও আহ্বান জানায়। মঙ্গোল আক্রমণের ভয়ে ভীত চীন ১৯১৩ সালের ৬ অক্টোবর এই ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে যোগ দেয়। ইতিপূর্বেই লাসাস্থিত চীনা সৈন্যদের (Suzarin State এর কারণে) খবরদারিতে ক্ষুব্ধ তিব্বতীরা চীনা সৈন্যদের ভীষণভাবে আক্রমণ করে বিপদাপন্ন করে। তখন দলাইলামাকে অনুরোধ করে চীনা সৈন্যদের ভারত হয়ে চীনে ফেরার ব্যবস্থা করে বৃটিশ সরকার। ১৯১২ সালেই দলাইলামা বৃটিশ আরোপিত Suzarainty (সীমিত সার্বভৌমত্ব)-র ললিপপ ছুঁড়ে ফেলে পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯১৩ সালে সিমলাতে অনুষ্ঠিত এই চুক্তি সম্পাদনের সময় চীনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ইভান চেন, তিব্বতের পক্ষে এক মন্ত্রী লাংচুং এবং বৃটেনের পক্ষে ম্যাকমোহন, সেই ম্যাকমোহন লাইন খ্যাত ম্যাকমোহন। ম্যাকমোহনের মধ্যস্থতায় নামমাত্র Suzarainty স্বীকার করানো হয় যাতে অভ্যন্তরীন প্রশাসনে চীনের কোনো প্রভাব না থাকে এবং চীনা সংসদে বশ্যতাজ্ঞাপক কোনো তিব্বতীয় প্রতিনিধি না পাঠানো হয়। সীমান্তর ব্যাপারে ম্যাকমোহন বহির্তিব্বত ও অন্তর্তিব্বত ধারণার প্রবর্তন করেন। বহির্তিব্বত ভারত সীমান্ত থেকে ইয়াংসি নদীর উপর প্রান্ত অবধি বিস্তৃত যা মাঞ্চু আমল থেকে বরাবর স্বীকৃত থেকে ছিল। এর পূর্বদিকের তিব্বত ভূমিকে বলা হবে অন্তর্তিব্বত। প্রায় ছয়মাস ধরে আলাপ আলোচনার পর এক ত্রিপক্ষীয় খসড়া চুক্তি প্রস্তাব তৈরি হয় যার মুখ্য অংশ ছিল—

(১) বৃটেন ও চীন তিব্বতকে এক সুজারিন রাষ্ট্র (সীমিত সার্বভৌমত্ব) হিসেবে গণ্য করবে, বহির্তিব্বতের স্বশাসন মানা হবে, তার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কারো কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। (২) ১৯০৬ সালের চুক্তিতে তিব্বতের উপর বৃটিশ প্রদত্ত চৈনিক একাধিপত্য (যার জন্য তিব্বতীরা ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিল) অস্বীকৃত হলো যদিও চীনকে বহিঃস্থ শক্তি মনে করা চলবে না এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বৃটেনই হবে সবচাইতে বেশি সুবিধাভোগী দেশ। (৩) বহির্তিব্বত ভারত ও

তিব্বত সীমান্ত-সহ চীন ও তিব্বত-প্রতিনিধিদের স্বাক্ষরিত মানচিত্র দলিল হিসেবে সংযুক্ত থাকবে চুক্তিপত্রের সঙ্গে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চীন সংশ্লিষ্ট মানচিত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিল যদিও মূল চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি তার ভবিষ্যৎ দুরভিসন্ধির জন্য। ঠিক হয়েছিল চীন মূল চুক্তিতে স্বাক্ষর না করা অবধি তিব্বত সম্পর্কিত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত থাকবে। অর্থাৎ সেই ১৯১৪ সালেই স্থিত ভারত-তিব্বত সীমান্ত স্বীকার করেই চীন স্বাক্ষর দিয়েছিল। এইগুলি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কারণ তিব্বত গ্রাস করার পরই এগুলি চীন ভারত সীমান্তে পরিণত হবে স্বাভাবিক ভাবে যা নিয়ে চীন গণ্ডগোল পাকিয়ে আসছে।

এদিকে চীনা সেনাপতি চাও-এর ফেঙ অধিকৃত তিব্বতীয় অঞ্চলগুলির দখল না ছাড়ায় তিব্বতও বৃটিশ অস্ত্র সরবরাহের অপেক্ষা না রেখে চীনা সৈন্যকে তাড়িয়ে চামডো অবধি দখল করে নেয়। ১৯১৯ সালের মে মাসে চীন ১৯১৪ সালের চুক্তির পরিবর্তন চাইলে দলাইলামা তা নাকচ করে দেন। ১৯৩৩ সালে ত্রয়োদশ দলাইলামার মৃত্যু হলে বাহ্যতঃ শোক জ্ঞাপনের জন্য জেনারেল ইয়াং-এর নেতৃত্বে বেতারযন্ত্র সমন্বিত এক শক্তিশালী প্রতিনিধি দল পাঠায় চীন। লাসায় যে দলটি কিছুদিনের মধ্যেই তিব্বতের উপর চীনা আধিপত্যের দাবি করে এবং চীন অনুগৃহীত পাঞ্চন লামাকে লাসায় আনার পরিকল্পনা করে। সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়।

চতুর্দশ দলাইলামা অর্থাৎ বর্তমান দলাইলামার অভিষেক উপলক্ষে উপস্থিত বৃটেন, নেপাল, ভুটানের সঙ্গে সঙ্গে চীন থেকে আগত উচ্চপদস্থ আধিকারিক উ-চ্যাঙ্কেও প্রতিনিধির মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই সময় অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় ভাবে এবং অপ্রয়োজনীয় ও বিসদৃশভাবে আধিপত্য দেখানোর জন্য চীন দলাইলামার জন্য অনুমোদন পত্র পাঠায়। এরপরই তিব্বত থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। তিব্বতের স্বাধীন সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। জাপানের বিরুদ্ধে চীন ও মিত্রশক্তির জন্য সামরিক সরবরাহ সচল রাখতে তিব্বতকে ব্যবহারের জন্য তিব্বত সরকারের অনুমতি চাওয়া হয়। তিব্বত সরকার তার নিরপেক্ষ অবস্থানের জন্য সে অনুমতি দেননি। তিব্বত চীনের অধীনস্থ হলে তা কি সম্ভব হোত? ১৯৪৪ সালে লাসার প্রেরিত চিপ্পং কাইনোকের উপদেষ্টা সেন-ৎ-সুঙ লিয়েন তাঁর বইতে তিব্বতের স্বাধীন অবস্থান স্বীকার করেছেন। তবুও চীনা দুরভিসন্ধি চলতেই থাকে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে নানকিং-এ চাইনিজ ন্যাশনাল এসেমব্লিতে তিব্বতকে আমন্ত্রণ জানালে চীন-অধিকৃত তিব্বতীয় অঞ্চল ফেরত পাবার দাবি জানাতে তিব্বত এক ডেলিগেশন পাঠায়। যদিও বৃটেন চীনের সম্ভাব্য দুরভিসন্ধির আভাস দিয়েছিল তিব্বতকে। অভ্যর্থনা জানিয়ে চীন অনেকদিন ওই ডেলিগেশনকে তিব্বতে ফিরতে দেয়নি। চীনের প্রচার যন্ত্রে এই উপস্থিতিকে অধীনস্থ রাজ্যের উপস্থিতি বলে বলা হয়। চীনাকূটনীতি অনুধাবনে অসমর্থ ডেলিগেশন এসেমব্লিতে গৃহীত সিদ্ধান্তে সই না করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে মনে করে ফিরে আসে। ১৯৪৭-এ চীন তিব্বতে গণবিদ্রোহের উস্কানি দেয় তার প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে। সে প্রথমে ব্যর্থ হয়। ভারত স্বাধীন হলে তিব্বত স্বাধীন হয়েছিল— এই উপলক্ষে দিল্লীর এশিয়ান নেশান সমাবেশে তিব্বতের নিজস্ব পতাকাও উত্তোলিত ছিল। মাও সে তুঙের নেতৃত্বে চীনা বিপ্লব সাফল্যের দ্বার প্রান্তে এলে নেহরু বিশাল দেশ চীনের সখ্যতা আকাঙ্ক্ষা করে ১৯৪৯ সালে বি. বি. সিতে এক বিবৃতি দেন—"We in India have had 2000 years of friendship with china. We have differences in opinions and even small conflicts, but when we hearken back to the long past something of the wisdom of the past helps us to understand each other." কিন্তু এক ঐতিহাসিককাল (তিব্বতের সাঁইত্রিশতম রাজা যাইসং দিউৎসলের সময় ৭৯২ খৃস্টাব্দ) থেকে বৈরীতা পোষণকারী সংকীর্ণ সম্প্রসারণবাদী চীন পিকিং বেতারে জানায়— "British imperialism and its running dog India, through their officially contributed publication, have declared in union that Tibet never acknowledged chinese suzarainty over it... Nehru, riding behind the imperialists whose stooge he is actually consider himself the leader of Asian people." নেহরু আত্মমর্যাদাহীন, এশিয়ান দেশগুলির নেতৃত্বলোভী ইত্যাদি কথা হজম করতে পারেন ধরে নিলেও running dog India —এই উক্তি তাঁকে নির্বিকারচিত্ত রাখে কি করে? এরপরও কোরিয়া যুদ্ধে চীনকে আক্রমণকারী দেশ হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ঘোষণার পরও, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমোদনে জেনারেল ম্যাক আর্থার ৩৮০ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন চীনকে খুশি করতে, চীনকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিব্বত আক্রান্ত হলো, যে ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম গিয়েছিল তিব্বতে, যে ভারতীয় পণ্ডিতদের পরিচালনায় তিব্বতের ধর্মীয় জীবনচর্যার বর্তমান চেহারা, যে তিব্বতি শিবিরের জনক ভারত, অভিভাবক মনে করা ভারত নেহরুর নেতৃত্বে চুপচাপ রইল তিব্বতের চরমতম দুঃসময়ে। ১৯৫০ সালের ৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে তিব্বত টেলিগ্রাফ করল, "The armed invasion of Tibet for the incorporation on Tibet in Communist China through seen physical force is a clear case of invasion... Tibetaus feels actually culturally and geographically they are far apart from the Chinese. If the Chinese find reactions of the Tibetaus to their unnatural claim not acceptable there are other civilised methods by which they could ascertain the views of the people of Tibet or should the issue be judical they are open to seen redress in an international court of law." একমাত্র এস সালভেডর-এর মতো ছোট্ট একটি দেশ ছাড়া আর কেউই এই পাহাড় ঘেরা শান্ত প্রকৃতির বিচ্ছিন্ন এবং নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতের আবেদনে সাড়া দিল না। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নির্লজ্জভাবে উদাসীন থাকল, সদস্য কেউ কেউ সজ্ঞানে অজুহাত তৈরি করল। একটা দেশ তার মত থাকতে চেয়েছিল তার নিজস্ব জাতিসত্তা ভাষা সংস্কৃতি, প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্য-সহ, এটা তার অপরাধ? এর নাম রাষ্ট্রসঙ্ঘ? পীড়ন, পোষণ, অত্যাচার সইতে সইতে ড্রাগনের বিষাক্ত নিশ্বাসে নিশ্চিহ্ন হবে?

১৯৫৯ সালে International Commission of Juwsts তাঁদের প্রতিবেদন "The question of Tibet and the rule of law"তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন—

Tibet's position on the expulsion of chinese in 1912 can be fairly described as are of de facto independence and there are as explained strong legal grounds to thinking that any form of legal subscrvience to china has vanished. It is therefore submitted that the eccents of 1911-12 mark the reemergence of Tibet as a fully soverign state independent in fact, in law, of chinese controll. কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ মূক ও বধির হয়েই ছিল। নেহরু চরিত্র অনুধাবন করে চীনা নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিল যে তাঁকে এবং তাঁর ভারতকে পঙ্গু করে রাখতে কী করতে হবে। ১৯৫৪ সালে চৈনিক ধাধার পঞ্চশীল চুক্তিতে ভারতকে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে ভারতের জমি দখলের উদ্যোগ শুরু করল। চীন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম এন রায়) নেহরুকে সেদিন মুলায়ম সিং যাদবের মতো সাবধান করেছিলেন।... নেহরু যে চোখে চীনা কমিউনিজমকে দেখছেন তাতে তিনি ভুল করছেন এবং এর দ্বারা তাঁরই সমর্থনে চীনের দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের সুবিধা হবে মাত্র। ...কমিউনিস্ট চীনকে নেহরুর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, আজ হাড়ে হাড়ে আমরা তা অনুভব করছি। কিন্তু তবুও আমরা কি শিক্ষা নিতে পেরেছি? আজ নীতিনির্ধারকদের বোঝা উচিত চীন অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে সেদিনের তুলনায় এবং বিশ্বাসঘাতকতা করায় সে এখন অনেক বেশি বেপরোয়া। ভারত কি তার বলি হবে?

ভারতকে বাঁচতে হলে চীনা আগ্রাসনের কালপঞ্জীটি বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে। ভারতভূমিকে পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞান করে তার কাশ্মীরের বৃহদংশকে উপঢৌকন দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে। ১৯৫৭ সালে ভারতের অধিকারে থাকা ইয়াটুঙ অঞ্চলকে তার টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সমেত চীনের হাতে তুলে দিলেন নেহরু, কারণ নেহরু কৃতার্থ হয়েছিলেন ১৯৫৩ সালের ২৮ নভেম্বর চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই ভারত ভ্রমণে এসে নেহরুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৯১৪ সালের ভারত-তিব্বত-চীন ত্রিপাক্ষিক সিমলা চুক্তি অনুযায়ী ম্যাকমোহন লাইনকে যেমন বর্মা (এখন মায়ানমার) সীমান্তে মেনে নিয়েছেন তেমনি ভারতের ক্ষেত্রেও মানা হবে। কিন্তু বাস্তবে কি হয়েছে? আজ অরুণাচল যখন তখন চীনের যুদ্ধে অনুপ্রবেশ ও আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। চীনের সঙ্গে যে কোনো সীমান্ত আলোচনায় এটিই প্রারম্ভিক বিষয়। উচিত ভারতীয় প্রতিনিধিরা এটা মনে মনে রাখছেন কি?

তারপর চৈনিক ভোজবাজী চলতেই থাকল। ১৯৫৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর চীন প্রকাশিত মানচিত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল চীনের বলে দেখানো হলো। ১৭ ডিসেম্বর চীনা বিমান ভারতের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করল। ১৯৫৯ সালের ১৭ জানুয়ারি ওয়াশিং সেক্টরে এবং নেফার লোহিত বিভাগে চীনা অনুপ্রবেশের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করা হলো। ২৪ জানুয়ারি চৌ এন লাই জানালেন ম্যাকমোহন লাইন চীন মানে না— ১৯৫৪ সালে একথা জানানোর উপযুক্ত সময় ছিল না। এই চীনের সঙ্গে চুক্তি কী প্রকাণ্ড মূর্খামি! সীমান্ত আলোচনায় এ প্রসঙ্গে এসেছেন কি ভারতীয় মুখপাত্র? ১৯৫৯ সালের ৩০ মার্চ দলাইলামা ভারতে আসতে বাধ্য হলেন। তাঁকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে চীন পরিকল্পনামাফিক জল ঘোলা শুরু করল— 'পঞ্চশীলচুক্তি' ভঙ্গ হচ্ছে। একে একে খিজামিন, সুবনাসারি দখল হলো। তীব্র প্রতিবাদে অভ্যস্ত ভারত যথারীতি প্রতিবাদ পাঠাল। ১৯৬১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার দু'দেশের অফিসারদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে নেফা অঞ্চলে চীনের ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকার দাবি এবং লাদাখ অঞ্চলে ১২৫০০ বর্গমাইল এলাকার দাবিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। চীন বহুদিন তার কোনো উত্তর দেয়নি। শেষে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে এলোমেলো উত্তর দেয় যা ভারত অগ্রাহ্য করে এবং তারপরই ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর পরিপূর্ণ যুদ্ধে নামে চীন।

সীমান্ত আলোচনা এখানে থেকেই শুরু হওয়া উচিত, আমাদের জানা নেই কী হচ্ছে আসলে। কিন্তু বছরের পর বছর চলে গেছে। ৫০ বছর ধরে চীন কলম্বো প্রস্তাবের সময়কার এল ও সি কে ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছে যদৃচ্ছভাবে। ভারত আক্রমণের পূর্ণ ব্যবস্থা পাকা করেছে চীন দিনের পর দিন। আর আমরা বালিতে মুখ গুঁজে নিরাপদ বোধ করছি। India's Defence Problem বইতে যাঁরা নেহরু সম্পর্কে লিখেছেন "Nehru himself offer his mission to China in 1954 when the picture of the future had began to take shape is reported as saying "I have to See India getting strong. I can not afford to have the chinese sitting on my back across the Himalayas." নেহরু এই ইচ্ছা পূরণে তাঁর উত্তরসূরিরা ইন্দিরা গান্ধী বাদে, কেউ অগ্রণী হয়েছেন উপযুক্তভাবে? তীব্র প্রতিবাদ পাঠানোর নেহরু দর্শনই বাহিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে— প্রতিরোধের দর্শন নয়, সংকল্প নয়। সম্প্রসারণবাদী চীন ধাক্কা খেয়েছে রাশিয়ার কাছে উত্তরী নদী দখলে, ধাক্কা দিয়েছে উপযুক্তভাবে ভিয়েতনামকে আর ভারতে পেয়েছে যদৃচ্ছ অনুপ্রবেশের অধিকার। কেন? আবার চৈনিক আক্রমণ হলে সহানুভূতি থাকবে কোন দেশের? চারশোরও বেশিবার অনুপ্রবেশ হয়েছে অবাধে— সশস্ত্র প্রতিরোধ, সংঘর্ষ হয়েছে কি? তাই তো চীন বলতে পারছে তাদের জায়গাতেই তারা যাচ্ছে না হলে কি সংঘর্ষ হোত না? দিল্লীর নতুন সরকার যদি সেই একই ক্লীবতার শিকার হয় ভারতবাসীর কপালে অশেষ দুঃখ আছে।

তথ্যসূত্র :

(১) The Chinse Betrayal B.N. Malik C.B.I. (ExDin). (২) Borodin : Stalin's man in China (H. U. press 1981). (৩) মানবেন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট : সমরেন রায়। (৪) M.N. Ray's Mission to China 1963 Robernc North and Xenia Endian.

(লেখক বাঁকুড়া খৃস্টান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’

নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ২০১৪ সালের জন্মজয়ন্তী উৎসবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ও বিদেশের লগ্নীকারী সংস্থাদের উদ্দেশে এক জোরালো আবেদন রাখেন ‘Make in India’ অর্থাৎ ভারতেই তৈরি কর। এই আবেদন শুধু শিল্পপতিদের উদ্দেশে নয়, মোদী ডাক দিয়েছেন শিল্প ও শিক্ষাজগতকে, সবরকমের লগ্নীকারীদের এবং তার সঙ্গে সমগ্র জনসাধারণকে যাতে একবিংশ শতাব্দী ভারতীয় শতাব্দীতে রূপান্তরিত হয়। তাঁর প্রধান লক্ষ্য কোটি কোটি গরিব শ্রমিক বিশেষত যুবক বেকারদের কর্মসংস্থান, তাদের উপযুক্ত ট্রেনিং এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, এজন্য গুরুত্ব দিচ্ছেন স্কিল ডেভালপমেন্ট এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া, এই দুটি কর্মসূচির উপর। এই প্রতিবেদনে প্রধান আলোচ্য হচ্ছে ‘‘মেক ইন ইন্ডিয়া’’ এবং তার সঙ্গে ‘‘স্কিল ডেভালপমেন্ট’’— এই দুটি কর্মসূচির।

দিল্লীতে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অন্যান্যরা।

বহু সাধারণ মানুষকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে ‘‘মেড ইন ইন্ডিয়া’’ কী আমরা জানি; কিন্তু ‘‘মেক ইন ইন্ডিয়া’’ ব্যাপারটা কী? মোদী কী ভুল বলছেন? না আদৌ ভুল নয়। মোদী ঠিকই বলছেন। তাঁর আহ্বানের মূল কথা হলো ভারতে বসে এদেশের কাঁচামাল ও ভারতীয় শ্রমিকদের কাজে লাগিয়ে ছোট বড় সবরকম সামগ্রী উৎপাদন কর। শিল্প, শিক্ষা, গবেষণা, দেশরক্ষা, যানবাহন, বসবাস, খাদ্যদ্রব্য, বেশভূষা ও বহু নিত্য প্রয়োজনীয় বা বিশেষ সময়ে সব দেশকে কিছু দেশে উৎপাদন করতে হয় এবং কিছু আমদানি ও রপ্তানি করতে হয়। এটি এক বিরাট কর্মযজ্ঞ এবং ভারতও সেই যজ্ঞে সামিল, আমাদের বিশেষ সমস্যা এই যে আমাদের কর্মযজ্ঞ পর্যাপ্ত নয় যাতে আমাদের দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার সব শ্রমিক কর্মসংস্থান পায়। এই বেকার সমস্যার সমাধান একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

স্বাধীনতার পর দেশ গড়ার স্বার্থে বহু ভারী শিল্প ও উচ্চমানের ব্যবস্থা রূপায়িত হয়েছে। যেমন বড় বড় ইস্পাত কারখানা, Dams, Highways, Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management ইত্যাদি এগুলির সঙ্গে প্রয়োজন ছিল ছোট ছোট শিল্প ও কারখানার ব্যবস্থা করা এবং skilled labour তৈরির জন্য বহু Industrial Trading Institute-এর। অবশ্যই অনেক হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় যা অপর্যাপ্ত। এর ফল ভাল হয়নি। প্রথমত, আমদানির চাহিদা বেড়েই চলেছে। জনসাধারণের যা প্রয়োজন তা দেশে তৈরি হয় না, পরিমাণ এবং গুণগতমান দুটোই কমের দিকে। ফলে আমদানির রমরমা। এতো গেল ভোগ্যপণ্য বা consumer goods -এর কথা। এছাড়া বহু ভারী যন্ত্রপাতি ও যুদ্ধসামগ্রী ইত্যাদি বিরাট অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রায় ভারতকে আমদানি করতে হয় অন্য দেশ থেকে। এর সঙ্গে দুঃখের কথা যে repair, spare parts বা maintenance-এর জন্য আমরা ওই রপ্তানিকারী দেশগুলির উপর নির্ভরশীল। এতো গেল আমদানির কথা, রপ্তানির চিত্রও তেমন উৎসাহজনক নয়। ভারতের রপ্তানির একটা বড় অংশ হচ্ছে কাঁচামাল যেমন খনিজদ্রব্য ইত্যাদি। উন্নত দেশগুলিকে দেখা যায় তাদের খনিজদ্রব্য সংরক্ষণ করতে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। আমাদের ওইসব চিন্তার বালাই নেই। আর ভাগ্যের বিড়ম্বনা এমন যে দেশে এত steel production সত্ত্বেও সামান্য ছুরি, কাঁচি, নেলকাটার ইত্যাদি নানাবিধ স্টিল প্রোডাক্ট এদেশে আসছে চীন, কোরিয়া ও অন্যান্য বাইরের দেশ থেকে। এখনও চীন থেকে আমদানি করা নিত্য প্রয়োজনীয় ও ফ্যান্সি সামগ্রীতে ভারতের বাজার ছেয়ে গেছে। শুধু চীন নয়, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশ কম দামে জিনিস বেচে ভারতের বাজার দখল করছে।

দেশে কোটি কোটি বেকার যুবক। প্রচুর কাঁচামাল সস্তায় বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে আর প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে আমদানি হচ্ছে নিত্য ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী যা ভারতেই তৈরি হতে পারে। অবশ্যই অনেক কিছু ভারতে তৈরি হয়েও গুণগতমানের জন্য এবং উচ্চমূল্যের জন্য দেশে বিকোচ্ছে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে মোদী সরকার যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করছে, যা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসছে। তাঁর চিন্তায় আছে কিছু উন্নতমানের পরিকল্পনা যার সাহায্যে ভারতে সব রকম উৎপাদন সম্ভব হবে এবং সেইসঙ্গে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান হবে। উৎপাদনকারীদের সেজন্য মোদী ভরসা দিচ্ছেন যে তাঁর সরকার সব রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত এবং সেজন্য এই সরকার আইনি ও আমলা ব্যবস্থার অপ্রয়োজনীয় মারপ্যাঁচ কমিয়ে বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দেশের সব লগ্নীকারী সংস্থার প্রতি তাঁর আহ্বান যে তাঁরা বাইরে অন্য দেশে না গিয়ে ভারতেই বিনিয়োগ করুন। বিদেশি সংস্থানের প্রতি তাঁর আহ্বান যে ভারতে আসুন এবং শিল্প গড়ে তুলুন। আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম দামে এখানে কাঁচামাল এবং শ্রমিক পাবেন। এই সুযোগ নিয়ে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ভারতেই নানাবিধ

সামগ্রী তৈরি করুক আর এটাই হচ্ছে ‘‘মেক ইন ইন্ডিয়া’’ মন্ত্র। মোদীজী আরও আশ্বাস দিচ্ছেন যে শিল্প স্থাপনা ও উৎপাদন পর্যায়ে যেমন সরকারি সহযোগিতা থাকবে তেমনি ভারতের বিরাট বাজারও অপেক্ষা করবে উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য। ভারতীয় শ্রমিকরা যত আর্থিকভাবে সক্ষম হবে ভারতের বাজারও তেমন বাড়তে থাকবে। এছাড়া ভারতে তৈরি সামগ্রী রপ্তানির ব্যাপারেও মোদী সরকার সবরকম সাহায্য করবে এই বিনিয়োগকারীদের।

এখন একটা প্রশ্ন আসছে যে ভারতে কাঁচামাল তো আছেই, কিন্তু বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন ট্রেডের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক পাবেন কী করে? ভারতে শতকরা ৬৫ জনের বয়স ৩৫ এর নীচে। তাদের একটা বিরাট অংশ কাজ পেতে চায়, কিন্তু তাদের যোগ্যতা কী? তারা কি স্কিল্ড লেবার? মোদীজী লক্ষ্য করেছেন যে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারি চিন্তাধারা ও পরিকল্পনার সঙ্গে বিভিন্ন ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও বিনিয়োগকারীদের চিন্তাভাবনার কোনো মতৈক্য বা সামঞ্জস্য নেই। সেজন্য দেশের বিরাট শ্রমিক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন ট্রেড আইডেন্টিফাই করে বিভিন্ন দলে যথাযথ ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। লক্ষ্য হবে এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিনিয়োগকারীরা তাদের প্রয়োজনমতো স্কিল্ড লেবার যেন পেয়ে যান।

আনন্দের বিষয় এই যে বর্তমান অব্যবস্থা সম্বন্ধে মোদীজী যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এবং যথাযথ সুরাহার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় study, survey এবং Institution building-এর পরিকল্পনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি ভাবনা— সরকার বহু বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে সামরিক ও অসামরিক সামগ্রী, এরোপ্লেন, নৌজাহাজ, ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কেনেন। সেগুলির repair ও spare parts-এর জন্যও ওই রপ্তানিকারী দেশগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু এখানে হাজার হাজার কোটি টাকার কনট্রাক্ট হয়েছে বা হবে, ক্রেতা হিসেবে ভারত ভবিষ্যতে ‘‘মেক ইন ইন্ডিয়া’’ সংক্রান্ত বিষয়টি বিক্রেতার কাছে দাবি করতে পারে। তার ফলে ভবিষ্যতে ভারত থেকেই ওই সব যন্ত্রপাতি রপ্তানি হবে এবং বহু কর্মসংস্থান হবে।

মোদীজীর ভাবনা ও লক্ষ্য দেশ জুড়ে যথাযথ ট্রেনিং দিয়ে এবং প্রয়োজনে বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে প্রভূত Skilled Manpower তৈরি করা। এই ট্রেনিংপ্রাপ্তরা দেশের ‘‘মেক ইন ইন্ডিয়া’’ প্রোগ্রামে সামিল হবে এবং যেসব দেশে অভাব আছে সেখানে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পারবে। এমন একটা সময় আসতে পারে যখন ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্তরা বিশ্বজুড়ে কর্মরত থাকবে। এদের সম্মিলিত উপার্জনে দেশের ব্যবসার বাজার আরও বড় হবে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। মোদীজী আশ্বাস দিয়েছেন, ‘‘মেক ইন ইন্ডিয়া’’ শুধু একটা শ্লোগান নয়, এটা আমাদের দায়বদ্ধতা, আমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে এগোতে পারি সারবিশ্বে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমাদের কথা শুনবে। এজন্য আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এফ ডি আই কথাটির উপর এইভাবে যে First Develop India এবং সঙ্গে সঙ্গে Foreign Direct Investment। এই দুই-এর মেলবন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে মোদীজী যেভাবে সঙ্কল্প দৃঢ়তা দেখাচ্ছেন তাতে ভবিষ্যতে ভারতের সুদিন আসার অপেক্ষায় বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। জয় হিন্দ।

(লেখক প্রবাসী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার)

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,

ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২১৮ ০৩৪৮

২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,

কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

ভারত-গঠনে মোদীর নতুন মন্ত্র ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’

অর্ণব নাগ ॥ বিজেপির প্রাক-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল কংগ্রেস-মুক্ত নতুন ভারত গড়ার। বিপুল নির্বাচনী সাফল্যের মুহূর্তেই ভাবী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বার্তা দিয়েছিলেন— ‘সুদিন আসছে’। এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কিংবা প্রধানমন্ত্রীর বার্তা নিছক কথার কথা ছিল না। এর পেছনে ছিল সুদূর-প্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী কিছু গভীর পরিকল্পনা। নয়া ভারত গঠনের এই পরিকল্পনার তথ্য-তালাসে স্বস্তিকা।

মোদীর নতুন মন্ত্র :

বিনিয়োগ টানতে বিনিয়োগকারীদের জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে উৎপাদন শিল্পে জোয়ার আসার অপেক্ষা। তাঁর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-র রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন তিনি নিজেই।

(১) গত ২৫ সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদীর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ ও ভারত গঠনের প্রচার মঞ্চস্থ হয়। মূলত উৎপাদন শিল্পকে গতি দিতে ও বিদেশি বিনিয়োগের খোঁজেই এহেন উদ্যোগ।

(২) এই প্রচারের জন্য যে লোগোটি তৈরি হয়েছে তা হলো গুজরাটের গির অরণ্যের একটি সিংহ, যার দেহটি নানা যন্ত্র দ্বারা গঠিত। ভঙ্গি আক্রমণাত্মক। এই প্রকল্পের প্রধান চালিকাশক্তি করা হয়েছে ডি আই পি পি-র সচিব অমিতাভ কান্ত-কে।

(৩) সরকারের আশা তাদের এই উদ্যোগের ফলে আগামী তিন বছরের মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের ‘ব্যবসা করার জন্য সুলভ স্থান’-এর নিরিখে ভারতের র‍্যাঙ্কিং-এ যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে। বর্তমানে এক্ষেত্রে ১৩৪তম স্থানে থাকা ভারত ৫০-এ উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

(৪) পঁচিশটি মুখ্য শিল্পক্ষেত্রকে সরকার চিহ্নিত করেছে। যার মধ্যে রয়েছে অটোমোবাইল, রসায়ন, তথ্য-প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যাল, টেক্সটাইল, উড়ান, চামড়া, পর্যটন, রেল ইত্যাদি। এগুলিতে ভারতের নেতৃত্ব দেবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

(৫) আধুনিক প্রযুক্তির পূর্ণসদ্ব্যবহার করে শিল্প-ছাড়পত্রের (ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স) আবেদন এবং শিল্প-উদ্যোগপতিদের স্মারকলিপি নেবার

অনলাইন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। ছাড়পত্রের মেয়াদ বাড়িয়ে তিন বছর পর্যন্ত করা হচ্ছে।

(৬) পাঁচটি এমন শিল্প-নগরী গড়ে তোলা হচ্ছে যেখানে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ থাকবে। টেক্সটাইল, চামড়া কিংবা খাদ্য- প্রক্রিয়াকরণের মতো উচ্চ-কর্মসংস্থানযুক্ত শিল্পমহল গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

(৭) প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ২০টি উৎপাদন শাখা গড়তে চলেছে। বহুসংখ্যক নিরাপত্তা সরঞ্জাম নির্মাণকে ইতিমধ্যেই ছাড়পত্র মুক্ত করা হয়েছে।

(৮) কাজের সময়ের ব্যাপারে বৃহত্তর নমনীয়তার জন্য এবং শিক্ষানবীশ নিয়োগ আরও বাড়াতে, সরকার শ্রম-আইন সংশোধনেরও পরিকল্পনা করেছে। শ্রমিক কলোনীগুলির করের পুনর্বিন্যাসও তাঁদের মাথায় রয়েছে।

(৯) ভারতে বিনিয়োগের ব্যাপারে একটি দল কাজ করবে। একটি এজেন্সি যারা বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবে তারা তাদের অনলাইন ব্যবস্থা চালু রাখবে বিনিয়োগকারীদের যাবতীয় তথ্য দেবার জন্য এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ-এর ব্যবস্থাটিও চূড়ান্ত করবে।

(১০) বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগের দরজা একশ’ শতাংশ খুলে দিতে চাইছে সরকার, এই ক্ষেত্রগুলির জন্য— নির্মাণ এবং কিছু নির্দিষ্ট রেলপরিকাঠামো প্রকল্পের চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে। স্বয়ংক্রিয় পথে এইসব ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ আসবে বলে সরকারের আশা।

জমি-সংক্রান্ত :

গত ২৭ জুন বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রীদের এক বৈঠকে ২০১৩-র জমি অধিগ্রহণ আইনের বড়ো পরিবর্তন করার ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

(১) পিপিপি (পাবলিক পার্টনারশিপ) প্রকল্পে অনুমোদনের যে ধারাগুলি থাকে তা সরকারের সঙ্গে জমি-মালিকের সরাসরি কথায় পর্যবসিত হতে পারে।

(২) ছোটো প্রকল্পের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা সমীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হতে পারে।

(৩) শিল্পের জন্য নেওয়া অব্যবহৃত জমি আসল জমি-মালিক বা তার উত্তরাধিকারীকে ফেরত দেবার যে বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা বাতিল করা উচিত বলে মনে করে কেন্দ্র।

(৪) ‘বিক্রয়ের চুক্তি’ অনুযায়ী জমির বাজারের দাম নির্ণয়ের যে প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তা পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলে কেন্দ্রের প্রস্তাব। যেহেতু এটা জমির দাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা উস্কে দিয়ে জমি-অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে জটিলতর করে তোলে।

(৫) জমি-অধিগ্রহণের জন্য এ-সংক্রান্ত রাজ্যের নির্দিষ্ট আইন পুরো প্রক্রিয়াটিকে চালনা করবে বলে কেন্দ্রের অভিমত। যা অবশ্যই সাধারণ আইন থেকে ছাড় পাবে।

পাথুরে রাস্তা :

যত যাই হোক, মোদীর ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র রাস্তা বড়োই দুর্গম। বহু বছরের জগদ্দল-পাথরকে তিনি যেভাবে ধাক্কা

দিয়েছেন তার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য। তাই আইন-সংশোধনের পথেই পা বাড়িয়েছেন তিনি। তাঁর সদিচ্ছা ও অটুট মনোবল নতুন ভারত গঠনের স্বপ্নকে সার্থক করবে বলে দেশবাসীর আশা। আপাতত মুশকিল আসান মোদীকে একনজরে দেখে নেওয়া যাক।

বিষয় : শ্রম-সংস্কার :

মূল সমস্যা : কিছু রাজনৈতিক মদতপুষ্ট শ্রমিক সংগঠন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থামন্ত্রকের কাজকর্মে নিরন্তর বাধার সৃষ্টি করে চলেছে।

মোদীর পরিকল্পনা : দ্য ডিপার্টমেন্ট অব্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি অ্যান্ড প্রমোশন (ডি আই পি পি) ২০টি শ্রম আইনের একটি তালিকা করেছে যা আশু পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

বিষয় : জমি-অধিগ্রহণ :

মূল সমস্যা : রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের অন্যতম বিরোধী শক্তি কংগ্রেস এক্ষেত্রে যেভাবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করছে তা অনভিপ্রেত বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। তার ওপরে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার জন্যও একাজ থমকে ছিল।

মোদীর পরিকল্পনা : গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক জমি অধিগ্রহণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৪-তে ১৯টি 'রেকমেন্ডেশন' চিহ্নিত করেছে তা সংশোধন করা হবে।

বিষয় : শক্তি ও কয়লা :

মূল সমস্যা : ক্রমাগত দুর্নীতি এই মন্ত্রকের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯৩ থেকে নির্ধারিত ২১৪টি কয়লা ব্লকের বাতিল এই শিল্পের ওপর দিয়ে বিশাল ঝড় বইয়ে দিয়েছে।

মোদীর পরিকল্পনা : কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক রেগুলারিটি কমিশন কয়লা ক্ষেত্রকে বিজাতীয়করণের প্রস্তাব দিয়েছে।

বিষয় : ব্যাঙ্কিং :

মূল সমস্যা : শক্তি শিল্প ও রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলি এক প্রকার অর্থহীনতায় ভোগে। নতুন 'ইক্যুইটি' জোগাড় করতে শেয়ার বেচার কোনো গরজ নেই ব্যাঙ্কের।

মোদীর পরিকল্পনা : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি স্পষ্ট করে দিয়েছেন ২০১৮-এর মধ্যে ২৪০,০০০ কোটি টাকার নতুন 'ইক্যুইটি' মূলধন করতে হবে ব্যাঙ্কগুলিকে।

বিষয় : সবুজায়ন :

মূল সমস্যা : কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক এবং জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের বড়ো সমস্যা বন অধিকার আইন লঘু হয়ে যাওয়া। পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের হাতেও বিষয়টি নেই।

মোদীর পরিকল্পনা : আইনটি খতিয়ে দেখার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক একটি প্যানেল গঠন করেছে। জাতীয় সবুজ নিয়ন্ত্রকের জন্য আদালতগুলিকেও সচেষ্ট ও সক্রিয় করার ইচ্ছে রয়েছে মন্ত্রকের।

(তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়া টু ডে)

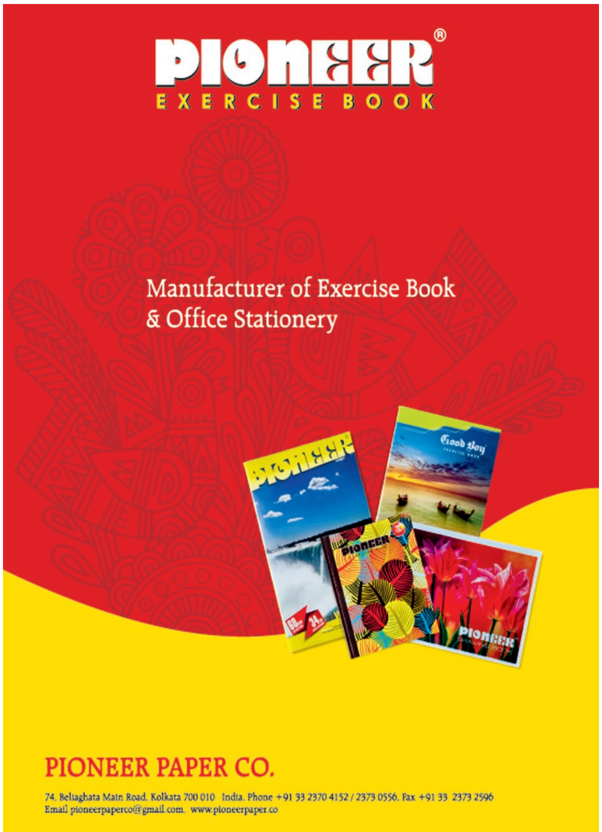

নেত্রদান মহাদান

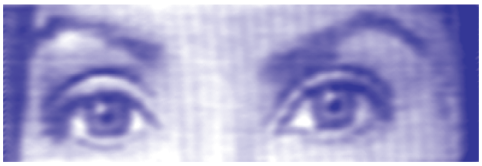

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

বাংলায় সর্বজনীন ক্ষমতাদেবীর আবাহন

সর্বজনীন ‘ক্ষমতাদেবীর উৎসব’ চলছে বাংলা জুড়ে! এ দেবী তৃণমূলী বাঙালির মহামমতা রূপী (থুড়ি মহামায়া রূপী!) সর্বজনীন সুপ্রিমো চিফ মিনিস্টার। আজ যে জননেত্রী হয়ে উঠেছেন ‘গানবাজ’দের আরাধ্যা দেবী মহামমতা দিদি। আমারও দিদি, বাবারও দিদি! সেই দীনবন্ধুর মতো আরকি! এঁর শাসনে মানুষের মুক্তি হবে, উন্নতি হবে— এমনই ভেবেছিল বাংলা ও বাঙালি। তাই মাতৃ ভেবে আরাধনা শুরু হয়েছিল। মায়ের সঙ্গে মাটি ছিল, তাতে ছিল মানুষের বিজ্ঞাপন। ‘মা-মাটি-মানুষ’-থিমের জীবনমুখী গানের সুরে মোহিত হয়ে জনগণ দেখতে পায়নি ‘ক্ষমতা’ লোভীর আবাহন হচ্ছে। আর তাঁর অভিধানে দুষ্টের সংজ্ঞা কি? তাঁর বিরোধী সমালোচকেরা ‘দুষ্টু’ এবং তাঁর অনুগতরা ‘শিষ্ট’। তাই তাঁর অভিধানানুসারে ‘চন্দনগরের মাল’ তাপস পাল, পুলিশকে বোম মারতে ইচ্ছুক অনুব্রত, পায়ের তল দিয়ে মারা মনিরুল, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আরাবুল, শঙ্কু, বিভেদকামী দেশদ্রোহী ইমরান হাসান তাঁর ‘শান্ত শিষ্ট’ শিষ্যদল। অনুগত ‘কলির কেষ্ট’রা হাঁপিয়ে উঠলে ‘অক্সিজেন’ জোগান দেন। দুর্গাপুজো হয় পদ্মফুলে। কিন্তু ক্ষমতা দেবীর আরাধনা চলে ঘাসফুলে। চারিদিকে তাই ঘাস ফুলের চাষ চলছে। কিন্তু পদ্মবীজের আয়ু বড়বেশি। শত ঝড় ঝাপটায় মরে না। ঘাসফুলের মাঝে পদ্মফুলের আবির্ভাব হচ্ছে। এটা তো অসহ্য। অসুর সেনা পাঠিয়ে শেষ করে দিচ্ছেন ক্ষমতাদেবী। অসুর মুক্ত বাংলা গড়তে নয়, বাংলা শাসন করতে দশ হাতে দশ অস্ত্র ধরেছেন ক্ষমতাদেবী— (১) মুসলমান তোষণ, (২) দান খয়রাতি, (৩) মিথ্যাচার, (৪) সমাজবিরোধী লালন, (৫) পুলিশি অত্যাচার, (৬) মিথ্যা মামলা, (৭) মিথ্যা কমিশন গঠন, (৮) স্বপক্ষীয় মিডিয়া পোষণ, (৯) শিলান্যাস, (১০) পুরস্কারাদি।

চিঠিপত্র

কলির দুর্গতিদেবী রাজ্যে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে চললে সব ঠিক আছে। বিরুদ্ধে গেলে ‘লাইফ হেল’। ক্ষমতাদেবী আবির্ভাবের পূর্বে সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন, ‘লালমুখো অসুরেরা ৩৫ বছরে যা করতে পারেনি, আমরা তা ৩ বছরের মধ্যে করে দেব।’ ঠিক তাই, আবির্ভাবের তিন বছরের মধ্যে লালমুখোদের (অপ) কীর্তিকে ছাপিয়ে গেছেন। সমাজ, পরিবার, পাড়া চুলোয় যাক, ক্ষমতাদেবীর জয় হোক।

—**বরুণ মণ্ডল,**
রানাঘাট, নদীয়া।

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা

অন্যবারের মতো এবারও শারদীয়া স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা আমার ও আমাদের চিত্তের জাগরণে সহায়ক হলো। এ প্রসঙ্গে কিছু কথা।

শারদোৎসবের আগমনে বাঙালি হৃদয়মাত্রই হয়ে ওঠে আনন্দ মুখরিত, এই আনন্দ মানুষের বহির্জগতের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতকেও করে তোলে আনন্দরসে সমানরূপে সিক্ত। অন্তর্জাগতিক আনন্দের প্রধান উৎস হিসেবে অবশ্যই বিভিন্ন পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যাকে চিহ্নিত করা যায়, আর এই আনন্দ নবোপলব্ধি ও অর্জনে রূপান্তরিত হয় যদি সেই শারদীয়া সংখ্যাটি হয় স্বস্তিকার মতো জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধসমৃদ্ধ ও নবচিন্তার উন্মেষ ঘটানোর মতো গল্প ও উপন্যাসের দ্বারা সমৃদ্ধ।

সুরুচিসম্মত প্রচ্ছদবিশিষ্ট পূজা সংখ্যাটি নয়নমনোহর, তবে অন্তঃসারশূন্য নয়। স্বামী অরুণানন্দের অধ্যাত্মসাগর মন্থন করে জ্ঞানামৃত তুল্য প্রবন্ধ ‘দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা’ দিয়ে পত্রিকাটির সূচনা। অধ্যাত্মজগতেরই আর এক মহারথী গৌরীমা’র জীবনী নিয়ে সবুজকলি সেন-এর লেখা তার পরেই। অধ্যাত্মজগতের সঙ্গে গোটা বিশ্বের সংযোগ স্থাপনকারী হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষ ও সংস্কৃতি জগতে তার অবদান নিয়ে ড. তুষারকান্তি ঘোষের লেখা ‘হিন্দু ধর্ম ও বর্তমান বিশ্ব’, প্রবন্ধটি মনোগ্রাহী। ইতিহাসে উপেক্ষিত চরিত্র চিত্তরঞ্জন সুতারের অবদান’ প্রবন্ধটি ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য আমাদের সামনে নিয়ে আসে। ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর ইতিহাস-নির্ভর প্রবন্ধ ‘ইসলামে নারীর স্থান : আফজল খাঁ ও তার ৬৩ জন বিবির হৃদয়বিদারক উপাখ্যান’ আমাদের করে তোলে অশ্রুসজল। ইতিহাস নির্ভর আরও কয়েকটি প্রবন্ধ এই পূজা সংখ্যাকে করেছে মহিমান্বিত, যেমন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের ওপর ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের ওপর রবিরঞ্জন সেনের লেখা, বাংলা-ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ওপর অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের লেখা দীর্ঘ দু’ হাজার বছরের ইতিহাসের সদাপ্রবহমান ধারাকে আমাদের সামনে প্রকট করেছে। সৌমেন নিয়োগীর আজিবক তীর্থের ওপর লেখাটিও প্রাচীন ইতিহাসের ওপর আলোকপাত করে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের শতবর্ষে এবং স্বাধীনতার ৬৭তম বর্ষে ‘ভারতীয় চলচ্চিত্রে জাতীয়তাবাদ’ নামক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটি উদ্দীপ্ত করবে সকলকেই।

কলকাতার পেশাদারি থিয়েটারের ওপর গোপাল চক্রবর্তীর লেখাটিও ইতিহাসের একটি বিস্মৃত অধ্যায়কে নিয়ে এসেছে পাঠকের সম্মুখে। অর্ণব নাগের লেখাটি ব্যতিক্রমী, শ্রদ্ধা ও স্মরণের আলোকে যাঁরা সদা উদ্ভাসিত হন তাঁরা ছাড়াও জনস্মৃতির অন্তরালে থেকে অনেক আত্মনিবেদিত ব্যক্তিই যে শিক্ষাজগতকে করেছেন সমৃদ্ধ তার নানা নিদর্শন পেশ করেছে ওঁর প্রবন্ধ ‘বই বৈ তো নয়’। তথাগত রায়ের ‘কেন এই ধর্ষণ বন্যা’ বর্তমান সামাজিক সমস্যা ও অবক্ষয়ের কথা তুলে ধরেছে। এই অবক্ষয়ের কারণ ও তার জন্য ভ্রান্ত শিক্ষানীতির দায়িত্ব বর্ণিত হয়েছে দেবীপ্রসাদ রায়ের লেখায়। বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু সভ্যতার বিপন্নতা বর্ণিত হয়েছে বাসুদেব ধরের লেখায়। ড. গোপেশচন্দ্র সরকার

‘যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় জন্মান্তরবাদ’ লেখায় বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মজগতের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সম্পাদক বিজয় আঢ্য মহাশয়ের ‘এক অপরাজেয় যোদ্ধা’ একনাথ রাণাডের মহান জীবনের প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

প্রবন্ধের গাম্ভীর্যকঠিন ভূমি থেকে একটু গল্প-উপন্যাসের জগতে আসা যাক। শিশুশ্রমিকের দুর্দশা এবং এ সুযোগ পেলে সেই শিশুশ্রমিকের উত্তরণ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে সুমিত্রা ঘোষের উপন্যাসে। শেখর সেনগুপ্তের উপন্যাস মনকে করে উত্তেজিত। সৌমিক ঘোষের উপন্যাস মানবজীবনের নানা চড়াই উৎরাইকে প্রকাশিত করেছে। বার্ধক্যের উপেক্ষা ও তার থেকে মুক্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে রমানাথ রায়ের লেখায়। গোপালকৃষ্ণ রায়ের গল্পে সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ, শেখর বসুর গল্পে অপরাধীর অন্তঃকরণ, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে নস্টালিজিয়ার অপমৃত্যু,

সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্তর লেখায় প্রান্তিক মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা, জিষ্ণু বসুর লেখায় মেধাবী মননের বিপথগামিতা ও জটিলতা, মেখলা মিত্রের লেখায় দৈনন্দিন দুর্নীতি, মৃগাঙ্কঙ্কৃষ্ণ রায়ের গল্পে বাহ্যিক সৌন্দর্যের বদলে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের জয়গান, সুনীল আচার্যের গল্পে সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক দুর্নীতি, প্রকাশিত হয়েছে এ সবই। তবে প্রত্যেকবারের মতো এবারও একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস থাকলে পাঠকসাধারণ আরও উপকৃত হোত।

—**প্রদীপ কুমার ঘোষ,**
বালি, হাওড়া।

যথার্থ দেশসেবক

গড়তে হলে দেশটাকে দেশসেবক চাই
স্বয়ংসেবক ছাড়া দেশে সত্যসেবক নাই।
বিজেপির নেতৃত্ব স্বয়ংসেবক ছাড়া
অন্যদের মতোই হবে দিশ্বিদিক হারা।
নতুন যারা বিজেপির সভ্য হতে চায়
স্বয়ংসেবক হওয়ার পরই সুযোগ যেন পায়।
আর এস এসের হাত ধরে গড়ে উঠুক দল
প্রতিষ্ঠিত হোক দেশে সনাতনী বল।
ব্রহ্মতেজে জাগুক শত তাজা তরুণ প্রাণ
মাভৈঃ বলে উঠুক জেগে মহা-হিন্দুস্থান।

—**অশোক কুমার ঠকুর,**
কামেশ্বরী রোড, কোচবিহার।

রঙ্গিয়া রেলগেট

বঙ্গাইগাও এন, এফ, রেলওয়ে রঙ্গিয়া ডি, আর, এম-এর অধীনে। এখানে প্রধান রেলগেটের দুইদিকে দেওয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিকটে ওভার ব্রিজ আছে বটে কিন্তু মানুষের ওই রকম ব্রিজ-এ যাতায়াত করা অসুবিধা। কেউ যাতায়াত করে না। এক কিলোমিটার দূরে একটি ফ্লাইওভার আছে। সব রকম গাড়ি ট্রাক, বাস অটো চলাচল করে। ঠেলা বা সাইকেল রিক্সা আরোহীদের এক কিলোমিটার দূরবর্তী এককিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার পারাপার খুবই দুরূহ ব্যাপার। আবার বন্ধ রেলগেট থেকে দু’ধারে লোহার পাত রেলপোস্ট দিয়ে ফ্লাইওভার পর্যন্ত আটকে দিয়েছে। কি করে মানুষ যাতায়াত করে? স্থানীয় অধিকর্তা আই ও ডাবলু, পুরনো কেবিনের কিনারায় দুই ধারে দেড় ফুট করে ফাঁকা জায়গা রেখেছে, সেই ফাঁকা দিয়ে সাইকেল আরোহী, হাজার হাজার পদযাত্রী রেললাইন পারাপার করে থাকে। যে কোনো দিন বিরাট আকারে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এই ব্যাপারে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের বা কোনো হেলদোল নাই। আমি জি এম মালিগাঁও এবং ডি আর এম রঙ্গিয়াকে জানিয়েছিলাম। তাঁরা ভাল মন্দ জনগণের সুবিধা-অসুবিধা বিচার বিবেচনা না করে প্রস্তাবটা খারিজ করে দিয়েছেন।

(1) Ref : No. W/218/RNY/ LXing W-7/596 Dt. 3.8.09.

(2) Ref : No. GM(W)/MLGL/ No. W/168/CE/TP/PT-11 (RNY) Dt. 16.7.09.

বর্তমান কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রীর কাছে আন্তরিক অনুরোধ— পূর্ণ তদন্ত সহকারে সমাধার জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

—**চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্তী,**
নর্থ বঙ্গাইগাঁও (ওল্ড কলোনী) অসম।

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :

**** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.**
**** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.**
**** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.**
**** Anti-Termite & Pest Control Treatment**

CONTACT :

Calcutta Waterproofing Company

'Park Plaza'

71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016

98311 85740/9831272657–

emil : roy4258@yahoo.com,

web : www.calcuttawaterproofing.com

সদ্‌গুরু নানকদেব

প্রকাশসিং অটল

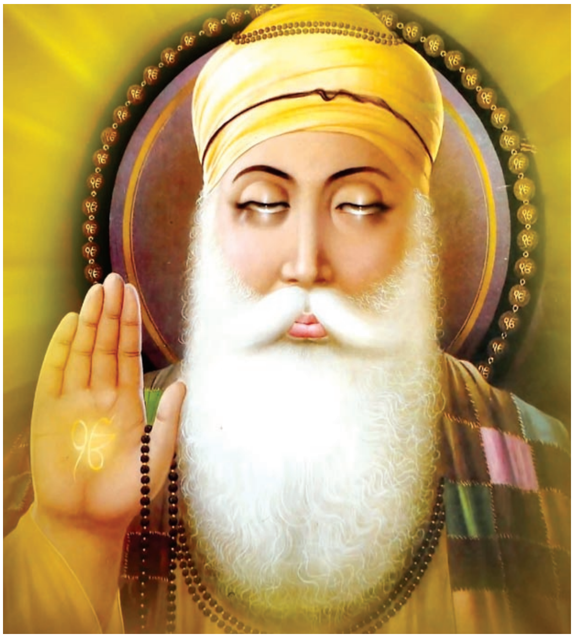

''সদ্‌গুরু নানক প্রগটিয়া, মিটী ধুন্ধ জগ চানন হোয়া।
জিউকর সূরজ নিকলিয়া, তারে ছুপে অন্ধের পলোয়া।।''

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে শ্রীগুরু নানকদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে সময় দেশে ধর্ম ও পরলোকের নাম নিয়ে সমস্ত সমাজ জাত-পাত, উচ্চ-নীচ, ছুত-অচ্ছুত-এ বিভক্ত হয়ে মানুষ পশুর থেকেও অধম জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। চারদিকে মিথ্যা ও ভণ্ডামির রমরমা ছিল। এরকম দুঃসহ পরিস্থিতিতে গুরু নানকদেব ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, লোক-পরলোক, মোক্ষ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেন। ব্যক্তির দুর্বলতা দূর করে অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সাহসের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার প্রেরণা তিনি দেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেওয়ার মন্ত্র সবাইকে দেন। যেমন—'জউ তব প্রেম খেলন কা চান, সিরধর তলী গলী মেরে আয়ো।'

গুরু নানকদেবের জন্ম লাহোরের কাছে তালবন্দী নামক স্থানে ১৪৬৯ খৃস্টাব্দে, ১৫২৬ সম্বৎ কার্তিকীপূর্ণিমার দিনে। এখন সেই স্থানকে নানকানা সাহিব বলা হয়। বাবা ছিলেন মেহতা কল্যাণ দাস ও মা তৃপ্তা দেবী। তাঁর বড়দিদি নানকীদেবী নানকদেবকে খুবই ভালোবাসতেন।

মাত্র ১৮ বছর বয়সেই নানকদেবজীর বিয়ে হয় বটালা নিবাসী মুলচন্দের কন্যা সুলক্ষিণী দেবীর সঙ্গে। কালক্রমে তাঁর ২ পুত্র সন্তান হয়— বাবা শ্রীচন্দ ও বাবা লক্ষ্মীচন্দ। বাল্যকাল থেকেই নানকদেব খুবই বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ছিলেন। ১৩ বছর বয়সেই তিনি হিন্দী, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর লিখিত পুস্তক 'জপুজী', 'বারহমাহা', 'আশা দীওয়ার' এবং 'সিদ্ধগোষ্ঠী'। আদিগ্রন্থের সম্পূর্ণ বাণীর সার জপুজী গ্রন্থেই আছে। তাঁর সম্পূর্ণ বাণী ১৯টি রাগে রচিত।

গুরু নানকদেব এক স্বতন্ত্র চিন্তাশীল, বিপ্লবী, সমাজ সংস্কারক এবং মহান সাধক ছিলেন। শিখ পন্থের তিনিই প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। তিনি সত্য ও স্পষ্টবাদী রূপে পরিচিত ছিলেন।

১৫২০ খৃস্টাব্দে বিদেশী আক্রমণকারী বাবর ও তার সৈনিকরা ভারতবর্ষের নিরীহ জনসাধারণের ওপর নানা প্রকারের অত্যাচার করতো। তাই আক্রমণকারী বাবরকে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে জাবর বলে সম্বোধন করেন। তাঁর অন্তরের ক্ষোভ তিনি এভাবেই বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন—

খুরাসন স্বসমানা কিয়া, হিন্দোস্তান ডরায়া।
আপৈ দোসু ন দেই করতা, জম করি মুগল চড়াইয়া।।
রুতী মার পঈ করলানে, তৈ কী দরদ ন আইয়া।
করতা তুঁ সমনা কা সোঈ।
জে সকতা সকতে কো মারে, তা মন রোস ন হোঈ।।

গুরু নানকদেব অধ্যাত্ম ও রাষ্ট্রধর্মের প্রসারের জন্য পাঞ্জাব ও অন্য রাজ্যের দূর দূর প্রান্তে ভ্রমণ করেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শন করেন। তিনি কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, গোরক্ষপুর, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কাশী, পাটনা, অসম, ঢাকা, বিদর, শ্রীলঙ্কা, সোমনাথ, দ্বারকা, জগন্নাথধাম, মথুরা, তিব্বত, লাদাখ, কাশ্মীর ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করে শিখ পন্থের বাণী প্রচার করেন। তিনি মক্কা ও মদিনা, ইরাক, ইরানে গিয়েও ঈশ্বরের সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ণনা তাঁর 'উদাসী' থেকে জানা যায়।

গুরু নানকদেব পাকিস্তানের করতারপুর শহর তাঁর ভক্তবৃন্দ নিয়ে ১৫২২ খৃস্টাব্দে পত্তন করেন। শেষ জীবনকাল তিনি করতারপুরেই অতিবাহিত করেন। সেখানে প্রতিদিন তিনি কীর্তন ও লঙ্গর সেবার প্রথা চালু করেন। তিনি যখন অনুভব করেন যে তাঁর লীলা অবসানের সময় আসন্ন তখন তিনি তাঁর শিষ্য ভাই লহণাজী (গুরু অঙ্গদদেব)-কে দ্বিতীয় নানকদেব রূপে গুরুপদ প্রদান করেন। এর কিছুদিন পরে ১৫৩৯ খৃস্টাব্দের ২২ নভেম্বর এক শুভ মুহূর্তে ইহলীলা সাঙ্গ করেন।

নানকদেবের সৎশিক্ষার সারসংক্ষেপ এই প্রকার :

 শিক্ষা নাও, কাজ করে যাও, ভাগ করে খাও।

তিনি জাতপাতের বিরুদ্ধে ছিলেন। গৃহস্থ জীবনযাপন করেও তিনি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের জ্ঞান আহরণ করেন। তাঁর শিখ-দর্শনের ভিত্তি হলো মানবতার সেবা, কীর্তন, সৎসঙ্গ এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস। তিনি নতুনভাবে সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সত্য ঈশ্বর অকাল পুরুষের বিষয়ে শাস্ত্রীয় উপদেশ দান করেছেন। তাঁর মতে ঈশ্বর নিরাকার, আত্মাস্বরূপ, সৃষ্টিকর্তা, অবিস্মরণীয়, অজর, অমর, কালাতীত এবং কর্তাপুরুষ। ঈশ্বর অন্তিম সত্যদাতা, নির্বৈর এবং সর্বব্যাপী। তিনি সৎনাম অবিনশ্বর ও সদৈব সত্য। ■

পৌরাণিক নগর বিদিশা

গোপাল চক্রবর্তী

বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ভূপাল থেকে ৪০ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে এই প্রাচীন নগরী অবস্থিত ছিল। বেস এবং বেত্রবতী নদীর সঙ্গমস্থলে এই পৌরাণিক নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থে এই নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের দশার্ণ অথবা পূর্ব মালবের রাজধানীরূপে বিভিন্ন নাম ছিল, যেমন— বিদিশা, বেদিশা, বৈদিশা অথবা বৈদাশা। প্রাচীন বণিক সম্প্রদায় সার্থবাহেরা এই নগরীতে বসবাস করত বলে এর আরেক নাম বৈশ্যনগরী। গরুড় পুরাণ অনুসারে বিদিশা ছিল শান্তিপ্রিয়, জনাকীর্ণ এবং সমৃদ্ধ নগরী।

বাণভট্টের 'কাদম্বরী'তে বিদিশা হস্তীদন্তের শিল্পের জন্য বিখ্যাত বলে উল্লেখ আছে। পুরাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই মত সমর্থন করে। বিদিশা চণ্ড প্রদ্যোতের রাজধানী ছিল। মৌর্য সম্রাট অশোকের মহিষী দেবী বিদিশার রাজকন্যা ছিলেন।

পৌরাণিক যুগ থেকে শুরু করে প্রাচীন ইতিহাসেও এই নগরীর গুরুত্ব সমুজ্জ্বল ছিল। মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত 'মেঘদূত' কাব্যের পূর্বমেঘে বিদিশা নগরীর এক মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন—

"তেষাং দিক্ষু
প্রথিতাবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
নত্বা সদ্যঃ ফলমাবিকলং
কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপাত্তস্তনিতসুভগং পাস্যাসি
স্বাদু যুক্ত
সভ্রূভঙ্গং সুখমিব পয়ো
বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি।।"

---"দেশে দেশে বিখ্যাত, বিদিশা এই নামে পরিচিত সেই দশার্ণের রাজধানীতে গিয়ে এবং সেখানে কামুকত্বের সমগ্র ফলটুকু সদ্য সদ্য লাভ করে বেত্রবতীর তরঙ্গচঞ্চল জল পান করবে।"

বিদিশার অনতিদূরে অবস্থিত বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায় যে বিদিশার হস্তীদন্তশিল্পীরা সাঁচীস্তূপের একটি তোরণ স্তম্ভের রূপকর্ম করেছিল। ভারহুত স্তূপের প্রথম স্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে বিদিশা নগরীর অধিবাসী রেবতী মিত্রের ভার্যা চাঁপাদেবী এই স্তম্ভের মূল্য বহন করেছিলেন। বিদিশা খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে প্রথম শতক পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। বেস নগরের গরুড়চূড়া যুক্ত স্তম্ভের লিপি থেকে জানা যায় যে কৌৎসীর পুত্র বিদিশার মহারাজা ভগভদ্রের রাজসভায় তক্ষশিলার যবনরাজ (গ্রীক) আন্তি আলিমিকিদের দূত, দিয়নের পুত্র এলিয়দোর (Haliodros) ভগবান বাসুদেবের পূজার জন্য এই গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বেতবা (বেত্রবতী) এবং বেস (বিদিশা) নদীর সঙ্গমস্থল বহু শতাব্দী ধরে অনাদৃত থাকার পর বিংশ শতব্দীর প্রথম দশকে দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এখানে প্রথম খননকার্য সম্পন্ন করেন। তার প্রায় ৫০ বছর পরে ১৯৬৩-৬৪ খৃস্টাব্দে মহেশ্বর দয়াল খারে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে উৎখনন করে এই নগরীর পুরাবৃত্তের সমীক্ষা করেছেন। তিনি দু'টি যুগের স্তর এবং সংস্তর আবিষ্কার করেছেন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম সংস্তরের আবিষ্কার প্রমাণ করে যে তাম্রযুগে বিদিশার অস্তিত্ব ছিল। এই সময়ে লালরঙের চিত্রিত কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল, কৃষ্ণ এবং লোহিত কৌলাল, স্ফটিকের ক্ষুদ্রাশ্মর আয়ুধের ফলা, পোড়ামাটির পুঁতি ব্যবহৃত হোত। এর উপরিস্তর চিত্রিত ধূসর কৌলাল (printed Grey ware) যুগের বলে অনুমিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

পরবর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য : উত্তর ভারতীয় চিক্কন কৃষ্ণবর্ণের কৌলাল (Nothern Black Polished ware) অঙ্কচিহ্নযুক্ত মুদ্রাসমূহ (Punch-Marked coins), তাম্র এবং লৌহনির্মিত বস্তু, পোড়ামাটির উদ্দেশিক পুষ্করিণী (Terracotta votive tanks), পাষাণ লিঙ্গ, পাথরের শিলনোড়া প্রভৃতির সঙ্গে দারুনির্মিত অন্তরাল, গর্ভগৃহ এবং প্রদক্ষিণ পথযুক্ত দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ প্রমাণ করে যে এটি প্রাক্ মৌর্য ও মৌর্যযুগের স্তর। সম্ভবত মৌর্য সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিদিশা নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর পুনর্নির্মিত হয়। পরবর্তী সংস্তর শুঙ্গ যুগের। কারণ এই স্তরে শুঙ্গলিপিতে উৎকীর্ণ মুদ্রা এলিয়াদোরের স্তম্ভের পাদদেশ এবং মৃন্ময়পুঁতি, শিল ও নোড়া, মসৃণ এবং অর্ধদগ্ধ অস্থিসমূহ ও রক্তমৃত্তিকার প্রদীপ পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী গুপ্তযুগে চিত্রিত মৃন্ময় কৌলালের সঙ্গে নক্সা উৎকীর্ণ কৌলাল, রৌপ্যমুদ্রা, পোড়ামাটির মানুষ এবং পশুমূর্তি সমূহ, সিলমোহর, শঙ্খের বালা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। খননে প্রাপ্ত প্রমাণানুসারে অনুমিত হয় যে খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই সমৃদ্ধশালী বিদিশানগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ষষ্ঠস্তরে একটি গ্রামীণ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবত হুন প্লাবনে পৌরাণিক বিদিশা নগরী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বহু শতাব্দী পরে কোনো ক্ষুদ্র গ্রাম বিদিশার ধ্বংসস্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যার বর্তমান নাম বেস নগর। কালচক্রে পুরাণ এবং ইতিহাসের বিদিশার বহু রূপান্তর হয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষ এমনকী বাঙালির মনেও বিদিশা নগরী চির ভাস্বর। কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতায় লিখেছেন—

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।" ■

বাংলার কয়েকজন শাক্ত সাধক

রবীন সেনগুপ্ত

সনাতন মার্গের যে শাখায় যে ব্যক্তিই সাধনা করুন না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাতৃবন্দনা তাঁদের করতেই হয়। সমস্ত কৃষ্ণ সাধককেই রাধা-মা-কে স্মরণ করতে হয়। গায়ত্রীমন্ত্র তো বহুজনেই চর্চা করেন। শিব সাধকদেরও মাতৃনাম করতে হয়। কিন্তু শক্তিদেবীর সাধক বলতে বিশেষ ভাবে মা কালী অথবা মা দুর্গার সাধকদেরই বুঝিয়ে থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কালীসাধক বাংলাতেই কাজ করে গেছেন। তাই বাংলায় শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিব ও গণপতি পূজার থেকেও কালী, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অধিক। মহারাষ্ট্র এলাকায় গণেশের, উত্তর ভারতে কৃষ্ণ, রাম, শিব পূজার প্রাবল্য বাংলার থেকে অধিক। কাজেই বাংলাকে অনায়াসেই দেশের সর্বাধিক শাক্তসাধক ও শক্তিদেবীর ভক্তের রাজ্য বলা যেতেই পারে। আর বাংলার এই সব মাতৃসাধকদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বামাক্ষ্যাপার মতো মহান ও অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ছাড়াও অন্য যাঁরা রয়েছেন তাঁরা হলেন— রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, তারাক্ষ্যাপা, বিশেক্ষ্যাপা, কামদেব তার্কিক, যাদবেন্দ্র ঘোষ, ডাবুকের কৈলাসপতি, মহাসাধক রাজা রামকৃষ্ণ, আনন্দনাথ, দ্বিতীয় আনন্দনাথ, খাঁকিবাবা, ব্রজবাসী ব্রহ্মচারী কৈলাসপতি, ভাতু গোস্বামী, যোগীন্দ্র ব্রহ্মচারী, কবীন্দ্র কর্ণাভরম, হরি ও হর সাধু, জটা বাবা অলকানন্দ, ঈশান ভট্টাচার্য, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী প্রমুখ। এই সব সাধকের মধ্যে সকলেই যে বাঙালি ছিলেন তা নয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই তারাপীঠ ও তৎসংলগ্ন এলাকার শক্তিপীঠে সাধনা করে গেছেন। মানুষকে সাধনলব্ধ ভক্তি, শান্তি, শক্তি ও সম্পদ প্রদান করে গেছেন। তাঁদেরই জন্য বাংলায় আজ শক্তিদেবীর ভক্তের সংখ্যাটা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। তাঁদের পরোক্ষ প্রভাবেই বাঙালিরা বিশ্বের বহু দেশে দুর্গা ও কালীপূজা করে বিদেশিদের সনাতন ধর্মের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে প্রভূত সাহায্য করছেন। হিন্দুধর্মকে বিদেশে প্রসারিত করতে স্বামী বিবেকানন্দর মতো কালীভক্ত, শ্রীল প্রভুপাদের মত রাধামায়ের ভক্তদের ভূমিকা যে সবার চেয়ে বেশি সে কথাই বা অস্বীকার করবে কে?

অসমের বিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যাতেও সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি তন্ত্রসাধকদের

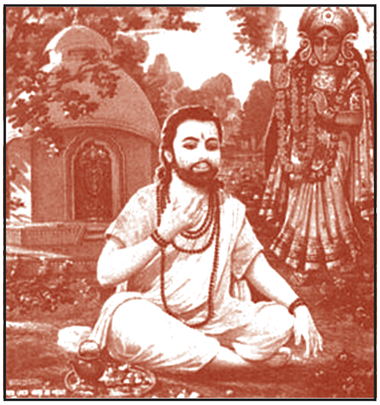

বিশেষ স্থান আছে। অসমের ওই এলাকার রাজারা বাংলা মুলুক থেকে মায়ের পূজার জন্য বাঙালি তন্ত্র সাধকদের সসম্মানে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন এমন ইতিহাসও কামাখ্যার যোনিপীঠ নিয়ে গবেষণা করলে পাওয়া যায়।

বামাক্ষ্যাপার দীক্ষাগুরু ছিলেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি। তিনি ব্রজধাম থেকে বৈষ্ণব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে ১২৬৪ বঙ্গাব্দে তারাপীঠে আসেন। কৈলাসপতি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব এই তিন ধারতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো সাধন সিদ্ধি করেছিলেন। অজস্রবার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেছিলেন কৈলাসপতি। লোক সমক্ষেই জলের উপর হেঁটে যেতেন, শূন্যে ভাসতে পারতেন, জলের নিচে ডুবে থাকতে পারতেন বহুক্ষণ। সঙ্গে থাকত তাঁর সাধন সঙ্গিনী। বামার সিদ্ধি লাভের পর তিনি শূন্যে উঠে মিলিয়ে যান, আর তাঁকে দেখা যায়নি ওই অঞ্চলে।

খাঁকিবাবা ১২৬০ বঙ্গাব্দে বাংলায় আসেন। তিনি রাজপুতনায় জন্মেছিলেন। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেকেই তাকে নানা সাহেব বলে বিশ্বাস করত। তারাপীঠে খাঁকিবাবা অনেকদিন তন্ত্র সাধনা করেন। ১১৯ বছর বয়সে তিনি দেওঘরে দেহরক্ষা করেন।

অলকানন্দ নামের তন্ত্র সাধক প্রায় ৫০০ বছর জীবিত ছিলেন। ঈশান ভট্টাচার্য অসামান্য ভাবময় মাতৃসঙ্গীত গেয়ে মুগ্ধ করে দিতেন বাঙালি ভক্তদের। হরি ও হর সাধুও অবাঙালি মাতৃসাধক। দুই জনে একসঙ্গেই আসেন তারাপীঠে। এক সঙ্গেই থাকতেন প্রায়শই।

সাধক রামপ্রসাদ সেন ও কমলাকান্ত বামাক্ষ্যাপার প্রিয়পাত্র ছিলেন। বামার বাড়িতে এই দুজনের রচিত গান গাওয়া হোত। বামা নিজেও এঁদের রচিত শ্যামাসঙ্গীত গাইতেন। কমলাকান্তের গুরু ছিলেন দ্বিতীয় আনন্দনাথ। জটাবাবার প্রকৃত নাম ছিল নারায়ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী। তিনি বহুজনের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিতেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে একটুও না ভিজে একস্থান থেকে অন্যত্র যাতায়াত করতেন তিনি।

প্রথম আনন্দনাথ ছিলেন ভবানীপীঠের প্রধান কৌল। আর ভাতু গোস্বামী বৈষ্ণব হয়েও তারাপীঠের মহাশশ্মানে সাধনা করতেন। অনাহারী বাবা নামে অপর একজন তন্ত্রসাধক দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতে পারতেন, অথচ বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী ছিলেন তিনি।

দেবদয়াল গিরি শৈব সাধক হয়েও কঠোর মাতৃসাধনায় নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। তিনি বিপুল যোগবিভূতি লাভ করে তা মানুষের সেবাকাজে লাগিয়ে ছিলেন।

নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণও ছিলেন এক মহান শাক্তসাধক। তিনি তারাপীঠে অর্থ সঙ্কট দূর করতে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

কবীন্দ্র কর্ণাভরম দক্ষিণ ভারতের মহাপণ্ডিত ও মহাসাধক ছিলেন। তিনি তাঁর সাধনসঙ্গিনী নিয়ে সুদূর চীন দেশে যান সাধনা করতে। সেখান থেকে দৈববাণী শুনে মগধের ত্রিহুতে গিয়ে যজ্ঞ করে দুটি দেবকন্যা লাভ করেন। তারপর পুনরায় দৈববাণী শুনে তারাপীঠের কাছে এক অপ্রকাশ্য সাধনপীঠ খুঁজে বের করে তার নাম রাখেন উদয়পুর। স্থানটি এখন কবিচন্দ্রপুর নামে খ্যাত।

শ্রীতারাপ্রণব ব্রহ্মচারী সাহিত্য-সাধনার জন্য কলকাতাসহ বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত। কলকাতার বইমেলায় বহুবার এই দীর্ঘজীবী তন্ত্রসাধকের সাধক জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ কাহিনী গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মন্ত্রশিষ্যও আছেন অনেকেই।

নবাঙ্কুর

ব্যাঙের সমুদ্র দেখা

সুকুমার রায়

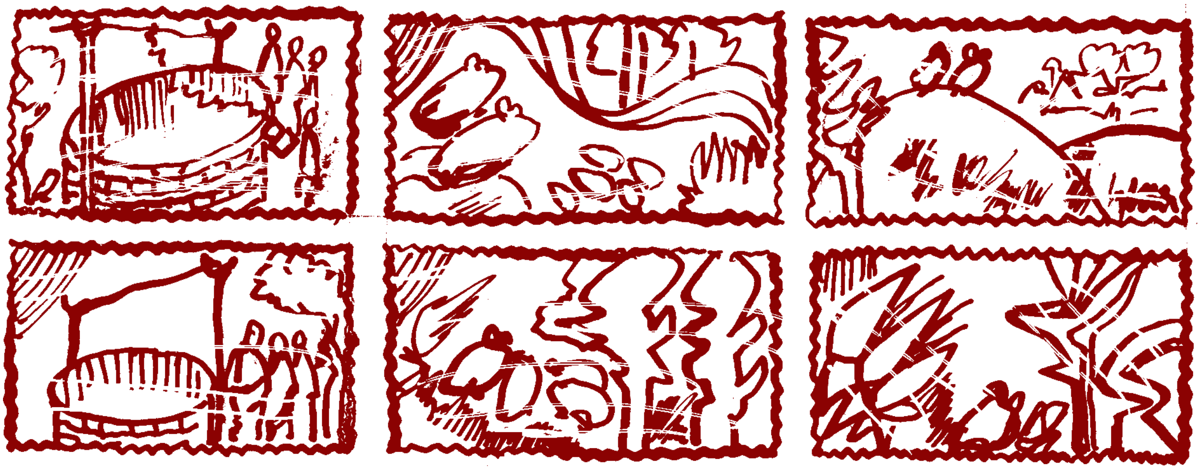

গ্রামের ধারে কবেকার পুরনো এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাঙ তার পরিবার নিয়ে থাকত। গ্রামের মেয়েরা সেখানে জল তুলতে এসে যে-সব কথাবার্তা বলত কোলাব্যাঙ তার ছেলেদের সেই-সব কথা বুঝিয়ে দিত—আর ছেলেরা ভাবত, 'ইস্! বাবা কত জানে!'

একদিন সেই মেয়েরা সমুদ্রের কথা বলতে লাগল। ব্যাঙের ছানারা জিজ্ঞাসা করল, ''হ্যাঁ বাবা! সমুদ্র কাকে বলে!'' ব্যাঙ খানিক ভেবে বলল, ''সমুদ্র? সে একরকম জন্তুর নাম।'' তখন একটা ছানা বলল, ''ওরা যে বলছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড়ো হয় আর তার মধ্যে অনেক অনেক জল থাকে— আর লোকেরা সাঁতার কেটে তা পার হতে পারে না!'' তখন কোলাব্যাঙ মুশকিলে পড়ল। সে গাছপালা দেখেছে, বাড়িঘর দেখেছে, মানুষ কুকুর ঘটিবাটি নানারকম জিনিসপত্র সব দেখেছে, আর ছেলেবেলায় অনেকরকম জিনিসের গল্প শুনেছে। কিন্তু সমুদ্রের কথা তো কখনো শোনেনি! তখন সে ভাবল, সমুদ্রের কথা একটু খোঁজ করে দেখতে হবে।

পরদিন সকালে উঠেই কোলাব্যাঙ তার ছাতা পোঁটলা নিয়ে বলল, ''আমি সমুদ্রের সন্ধান করতে যাচ্ছি।'' তার গিন্নী কত কাঁদল, ছেলেরা নানারকম সুর করে তাকে বারণ করল কিন্তু কোলাব্যাঙ বলল, ''না, এতে আমার জ্ঞানলাভ হবে— তোমরা বাধা দিয়ো না।'' এই বলে সে পাতকুয়ো থেকে উঠে একটা মাঠের দিকে চলল। ব্যাঙ বাইরে এসেই দেখল মানুষ কুকুর গোরু তারা কেউ তার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না— তাই দেখে সে ভাবল, 'লাফিয়ে চললে সবাই আমায় বেকুব ভাববে।' এই ভেবে সে হেঁটে হেঁটে চলতে লাগল। কিন্তু অমন করে চলা তো তার অভ্যাস নেই— খানিক দূর গিয়েই তার ভারি পরিশ্রম বোধ হলো।

মাঠের ওপারে আর-এক গ্রামের কাছে এক গর্তের মধ্যে মেটে ব্যাঙদের বাসা ছিল। মেটে ব্যাঙেরাও সমুদ্রের কথা শুনেছে, তাই তাদের মধ্যে একজন বেরিয়েছে সমুদ্রটা দেখতে। মাঝপথে দুই ব্যাঙের দেখা হলো। কোলাব্যাঙ বলল, 'আমি ফাটলকুয়োর কোলাব্যাঙ, যাচ্ছি সমুদ্রে।'' মেটে ব্যাঙ বলল, ''আমি মেটো-মাটির মেটে ব্যাঙ, আমিও যাচ্ছি সমুদ্রে।'' তখন তাদের ভারি ফুর্তি হলো।

কিন্তু সমুদ্রে যাবার পথ তো তারা জানে না। মাঠের মধ্যে একটা মস্ত ঢিপি ছিল, মেটে ব্যাঙ বলল, ''ওর উপরে উঠে দেখি তো কিছু দেখা যায় কিনা।''

এই বলে তারা অনেক কষ্টে সেই ঢিপির উপর চড়ে সেখানে থেকে একটা গ্রাম দেখতে পেল। মেটে ব্যাঙ বলল, ''আরে দূর ছাই! এরকম তো ঢের দেখেছি! আমার বাড়ির কাছেই তো অমন আছে।'' কোলাব্যাঙ বলল, ''তাই তো! আমিও ছেলেবেলা থেকে ওরকম কত দেখেছি। সব জায়গায় দেখছি একরকম। মিছিমিছি আমরা হেঁটে মরলাম।''

তখন তারা ভারি বিরক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল। কোলাব্যাঙ তার ছানাদের বলল, ''সমুদ্র-টমুদ্র কিছু নেই, ওসব মিছে কথা!''

(জাপানি গল্প)

সংকলন : কৌশিক গুহ

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

রং ভরো

প্রশ্নবাণ

১. 'নীলদর্পণ' কার লেখা? এই নাটকের জন্যে কার কারাদণ্ড হয়েছিল?

২. 'পরশুরাম' কোন্ লেখকের ছদ্মনাম? সত্যজিৎ রায় তাঁর কোন্ কোন্ গল্প নিয়ে ছবি করেন?

৩. 'তিতাস একটি নদীর নাম' কার লেখা? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে? ওই কাহিনী নিয়ে নাটক ও চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?

৪. শম্ভু মিত্র কি জন্যে বিখ্যাত? কোন্ দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

৫. 'মহাপ্রস্থানের পথে' কে লিখেছেন?

উত্তর : ১. দীনবন্ধু মিত্র। রেভারেন্ড জেমস লঙ। ২. রাজশেখর বসু। পরশপাথর, বিরিঞ্চিবাবা। ৩. অদ্বৈত মল্লবর্মণ। ১ জানুয়ারি ১৯১৪-২৬ এপ্রিল ১৯৫১। উৎপল দত্ত, ঋত্বিককুমার ঘটক। ৪. নাট্যকার, নাট্যরূপকার, পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা। বহুরূপী। ৫. প্রবোধকুমার সান্যাল।

এসো আবার পড়ি

আলোর শিশু

অশোকবিজয় রাহা

একটি আলোর শিশু খেলা করে সমস্ত
সকাল :
ঝলমল ঘাসের শিশিরে
মাঠময় ছুটোছুটি করে
চারদিকে ঝোপে-ঝাড়ে
মুঠো-মুঠো প্রজাপতি ছাড়ে
নাড়া দেয় করবীর ডালে
দোপাটিরা দুলে দুলে হাসে
টগরের চারাগুলি হঠাৎ ময়ূর হয়ে নাচে
শালিখেরা চমকে তাকায়
কাঠবিড়ালীটি ফিরে চায়।

হঠাৎ সে হাওয়ায় মিলায়
আবার কখন
ছুটে এসে শিউলিতলায়
একরাশি শিউলি ঝরায়
শিরীষের ডালে
ঝিলমিল পাতার আড়ালে
চুপি চুপি উঁকি দেয় এসে
পাখির শিসের মতো বাজায় পাতার
কচি বাঁশি
একটু পরেই
আমলকীবীথি দিয়ে ছুটে যায় খিলখিল
হেসে।

অবাক তাকাই
এইবার কোথাও সে নাই
চোখ পড়ে দূর মাঠে—যেখানে আকাশে
কাশফুল হাসে
শরবনে ঢেউ খেলে যায়,
চেয়ে দেখি ঢিবির চূড়ায়
মেতেছে সে নতুন খেলায়
মুঠো-মুঠো কাশফুল ছিঁড়ে
দুই হাতে হাওয়ায় ওড়ায়।

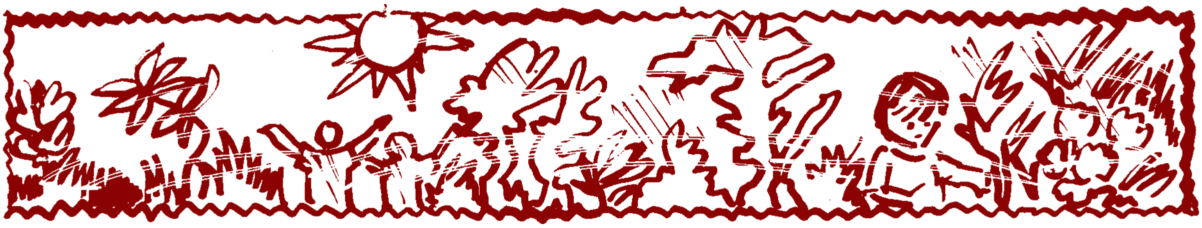

সন্তান ‘মানুষ’ করায় মায়ের ভূমিকা

লক্ষ্মী দাস

সন্তান ভাল বা খারাপ ‘মানুষ’ হওয়ার জন্য মা-বাবার ভূমিকাই মুখ্য থাকে। মা-বাবার মিলিত স্নেহ সন্তানের পক্ষে খুবই জরুরি। দু’জনেরই সান্নিধ্য ও ভালোবাসা সন্তানকে কেবল খারাপ সংসর্গ থেকে রক্ষাই করে না, ভবিষ্যতে তাদের নেশার জগৎ থেকেও দূরে রাখে। একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, মা-বাবার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত সন্তানরা মদ ও চরসের মতো নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে।

তবু সন্তান মানুষ করায় প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা মায়েরই থাকে। সন্তানের প্রতিপালন একজন মা তখন থেকেই করে যেদিন সে তার গর্ভে আসে। সেদিন থেকেই সুস্থভাবে সন্তান যাতে পৃথিবীর আলো দেখতে পারে তার জন্য চিকিৎসকের সুপরামর্শ, খাওয়া-দাওয়া, নিয়ম করে চলা-ফেরা, এমন নানান নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। গর্ভে থাকাকালীন সন্তানের নড়াচড়া ও হৃৎস্পন্দন একজন মা ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। এরপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার সেই ছোট্ট মুখের হাসি, কান্না আর দুষ্টুমি সবটাই কত মিষ্টি মায়ের কাছে। শুরু হয় মায়ের হাত ধরে প্রথম পথ চলা। এরপর তাকে কীরকম পোশাক পরাবে, কীভাবে সাজাবে, কোন স্কুলে পড়াশোনা শেখাবে, পড়াশোনা ছাড়াও অন্য কোন দিকে তার আগ্রহ সেটা বুঝে তাকে সেইসব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও মায়ের ভূমিকা কিন্তু সবচেয়ে বেশি।

সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা-কে সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হয়। যেটা সবাই বুঝতে পারেন না। শুধু শাসন করলেই চলবে না তার কথা শুনতে হবে, তাকে বুঝতে হবে। কারণ সন্তান বড় হলে কখনই তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাফেরা সম্ভব নয়, সে কোথায় কী করছে তা বোঝাও সম্ভব নয়। যদি বন্ধুর মতো মেশা যায় তবে সে যে-কোনো ঘটনাই নিঃসঙ্কোচে মা-কে বলতে পারে। আর তখনই তো তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় বোঝানো সম্ভব। মা ছাড়া আর কারো কাছে সন্তান এতটা সহজ হতে পারে না। তাই তো মায়ের লেখাপড়া জানা জরুরি, তা না হলে সন্তানকে ন্যায়-অন্যায় বোঝাবেন কী করে!

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা, শিষ্টাচার সেটাও সে বাড়িতে মা-বাবার কাছ থেকেই পেয়ে থাকে। সন্তান বেশিরভাগ সময়টাই মায়ের সঙ্গে থাকে, তাই তাকে বোঝা মায়ের পক্ষেই সম্ভব। সন্তানের কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যে মায়ের কোনো বিকল্প নেই। মা শুধুই মা। কথায় আছে— ‘কু-পুত্র যদি বা হয়, কু-মাতা কখনো নয়’। শ্রীকৃষ্ণের মা বলতে আমরা দেবকীর থেকে যশোদাকেই বেশি জানি। যশোদানন্দন বলেই সে পরিচিত। কারণ তিনিই তাঁকে ছোটো থেকে প্রতিপালন করছেন।

সন্তানকে ছোটো থেকে কত যত্ন করে মাকে পালন করতে হয়, কত কিছু ত্যাগও করতে হয়। তবে প্রতিদান হিসাবে যে কখনও চোখের জল ফেলতে হয় না তাও বলা কঠিন। এই তো সেদিন টিভিতে দেখলাম সম্পত্তির লোভে মাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে ছেলে, ছেলের বৌ দুজনেই বেড়াতে গেছে। তিন-চার দিন পর পাড়া-প্রতিবেশী এবং পুলিশের সহযোগিতায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু তা-সত্ত্বেও ছেলের প্রতি মায়ের কোনো অভিযোগ নেই, বরং ছেলে ভুল করেছে বলে পুলিশকে কোনোরকম শাস্তি না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ছেলের অন্যায়কে মেনে নিয়েও তাকে ক্ষমা করা মা ছাড়া কে করতে পারে? ‘মা’ এই একটা শব্দের কি তাৎপর্য, এটাই তো সব সন্তান বুঝতে পারে না। এখানে কি বলা যেতে পারে যে মায়ের সন্তান প্রতিপালনে কোনো ফাঁক ছিল? না তা নয়, তবে ছেলে বড় হওয়ার পর তার বুদ্ধি-বিবেচনা পরিবর্তনের ফলে কিংবা অন্য কারো প্ররোচনায় অথবা বিদেশী ভাবধারায় সে এধরনের কাজ করে থাকে। সন্তানের সঙ্গে মায়ের মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক চিরকাল অটুট থাকাই তো ভারতীয় সংস্কৃতি। ■

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
‘বিল্লদাকুঞ্জ’
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

ভারতে তৈরি করুন : নিবেশকারীদের প্রতি আহ্বান

নিবেশকারীদের উদ্দেশ্যে 'রেড কার্পেট' পেতে দিয়ে অভ্যর্থনার আহ্বান জানিয়ে এনডিএ সরকার দেশের নির্মাণ শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করলো। এই প্রক্রিয়ায় ২৫টি সেক্টরকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেসব ক্ষেত্রে দেশের দক্ষতা রয়েছে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবার। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমেরিকার ১১ জন শীর্ষস্থানীয় সি ই ও-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন যাঁদের মধ্যে রয়েছেন গুঞ্জনের এরিক স্কিমিউট, ডেভিড এম রুবেনস্টাইন, সিটি গ্রুপের কর্তা মাইকেল করব্যাট, ক্যাটারপিলার ইঙ্কের ডগ ওবার হেলম্যান প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর নির্বাচনী ভাষণে এবং স্বাধীনতা দিবসের জাতির উদ্দেশে ভাষণে 'ভারতে তৈরি করুন' স্লোগানের মাধ্যমে প্রচার শুরু করেছেন। মার্কিন যাত্রার ঠিক প্রাক্কালে প্রচার অভিযান শুরু করেছেন 'ভারতে আসুন এবং এদেশে আপনাদের পণ্য তৈরি করুন'। এই আহ্বানের মাধ্যমে তিনি দেশকে নির্মাণ শিল্পে এক অগ্রণী দেশ তৈরি করতে চান। মোদীজী আরও বলেছেন, সরকার বিদেশি নিবেশকৃত ভারতীয় সংস্থা যদি অন লাইনে তাদের সামগ্রী বিক্রি করতে চান তবে সরকার তারও অনুমোদন দেবেন। অবশ্য সেই সব সামগ্রীর তিন-চতুর্থাংশ ভারতে নির্মাণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকতর এবং দেশজ শিল্পকে উৎসাহ প্রদান করা। টাটা সনসের চেয়ারম্যান সাইপ্রাস মিস্ত্রি, মারুতি সুজুকির কর্ণধার কেনিচি আয়ুকাওয়া, আর আই এলের এম ডি মুকেশ অম্বানি, বস ইন্ডিয়ার ইডি ফ্রানজ্ ইবার, উইপ্রোর চেয়ারম্যান কুমার মঙ্গলম বিড়লা, আই সি আই সি আই-এর সি ই ও চন্দা কোচর প্রমুখ শিল্পের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। 'ভারতে তৈরি করুন' এই আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফিকির সভাপতি সিদ্ধার্থ বিড়লা বললেন, 'আমরা ভারতের জন্য যে পথের সন্ধান পেয়েছি তাতে ভারত অচিরেই দুনিয়ায় অন্যতম শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গণ্য হবে। এর আগে আমরা কখনওই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করিনি। এর লক্ষ্য হলো— লক্ষ লক্ষ উদ্যোগপতিদের উৎসাহ প্রদান করা যাঁরা নিরলসভাবে বহু বছর ধরে কাজ করে চলেছেন— দেশকে সারা বিশ্বের কাছে এক উৎকর্ষতম পণ্য নির্মাণকারী দেশ হিসেবে তুলে ধরার জন্য। যেসব পণ্য শুধু দেশের চাহিদা-ই মেটায় না, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেরও চাহিদা মেটায়।"

শ্রীবিড়লা আরও বললেন, "ফিকি এবং তার সমগ্র সদস্যবৃন্দ সতত প্রয়াস চালাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে দেশজ পণ্যের গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে"। তিনি আরও বলেন, "মেক ইন ইন্ডিয়ার" স্লোগান ভারতীয় নির্মাণ শিল্পের এক প্রারম্ভিক সোপান"। শিল্পমহল এতদিন এর প্রত্যাশায় ছিল কারণ শিল্পের উন্নয়ন পিছনে পড়ে ছিল এবং বহু বছর ধরে আমাদের দেশের শিল্পের গতিবিধি আটকে ছিল গড় জাতীয় উৎপাদনের ১৫-১৬ শতাংশের মধ্যে। প্রতিমাসে লক্ষ লক্ষ কৃষি বহির্ভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়তে নির্মাণ শিল্পের বার্ষিক ১২-১৪ শতাংশ বৃদ্ধির প্রয়োজন। যেসব বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা দরকার সেগুলো হলো :

- অনুকূল বাণিজ্য আবহাওয়া গড়ে তুলে আর্থিক পরিকাঠামো গড়ে বাণিজ্য আবহকে সহজতর করা।
- নির্মাণ শিল্পকে উৎসাহ দিতে পরিবেশ-বান্ধব অবস্থা গড়ে তোলা দরকার যা আসলে অন্য অনুসারী শিল্পের সঙ্গে একসূত্রিতা গড়ে তুলবে।
- প্রত্যক্ষ বিদেশি নিয়োগ আহ্বান করতে গিয়ে সমগ্র পদ্ধতিকে আরও বেশি উদার করতে হবে বিশেষত মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে।

'ইনভেস্ট ইন্ডিয়া' নামক এক সংস্থা গড়া হয়েছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার জন্য যা সেল হিসাবে কাজ করবে। প্রধানমন্ত্রীর এই যোজনাকে সার্থক করতে 'ফিকিতেই' গড়া হয়েছে এই বিশেষ সেল যাদের কাজ হলো পুঁজি নিবেশকারীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করা।

'ইনভেস্ট ইন্ডিয়া' একটি অ-লাভজনক সংস্থা যে সংস্থা ভারত সরকারের বাণিজ্যমন্ত্রকের অধীন শিল্পনীতি নির্ধারণ এবং উন্নয়ন দপ্তর, রাজ্য সরকার এবং ফিকির সঙ্গে একত্রে কাজ করবে।

এই 'নিবেশকারী সহায়ক সেল' নিম্নোক্ত সহায়তা করবে সেইসব সংস্থাকে যারা এদেশের গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে।

- এরা সমগ্র ক্ষেত্রের তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে বিনিয়োগকারীদের।
- এরা বিনিয়োগগত তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগসূত্রের মাধ্যমে প্রোজেক্ট রূপায়ণে মদত দেবে।
- এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিনিয়োগকে স্বাগত জানাতে এবং সর্বপ্রকার সুবিধা প্রদানে সহায়তা করা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদানে তদারকি করা।
- এরাই বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্যগুলির শিল্পনীতি বিশেষত জমি, শ্রমিক, পুঁজি এবং বিনিয়োগ নিয়ে সমস্যা মেটাতে সহায়কের ভূমিকা পালন করবে।
- এদের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যগুলির বিশেষ সুবিধা, ছাড় ইত্যাদি জানা যাবে সহজেই।
- এরাই ব্যবস্থা করে দেবে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর এবং এজেন্সির সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের সমন্বয়ের।

সরকার ইতিমধ্যেই তৈরি করে দিয়েছে বিভিন্ন আর্থিক দপ্তরে নোডাল অফিসার এবং রাজ্য সরকারকে সহায়তা করতে এদের কাজ হবে 'বিনিয়োগ সহায়তা সেলকে' আরও তৎপর হতে উৎসাহ দেওয়া। ■

খাগড়াগড়ের পর একের পর এক বিস্ফোরণ উদ্ধার বহু বেআইনি অস্ত্র, গোলা-বারুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ২ অক্টোবর, ২০১৪ : দুপুর ১২টায় বর্ধমানের খাগড়াগড়ে-র একটি বাড়িতে বিস্ফোরণ। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় দুই জঙ্গির দেহ। আহত ১, দুই মহিলাকে আটক করে পুলিশ।

৩ অক্টোবর, ২০১৪ : ঘটনাস্থলে আসে সিআইডি দল। সেখান থেকে ৫৫টি গ্রেনেড-সহ উদ্ধার টাইমার লাগানো ৮টি সার্কিটবোর্ড, ৩০ রকমের রাসায়নিক, ৩টি মোবাইল, বিস্ফোরক তৈরির বই এবং জেহাদি বই। এছাড়াও ৫০টি হ্যান্ড রকেট, ১০ কেজি অ্যামোনিয়াম এবং গুলির খোল।

৫ অক্টোবর, ২০১৪ : মালদা জেলার ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ১নং অঞ্চলের নরেন্দ্রপুর গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যু এবং ৩ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাস্থল থেকে মিনি ককটেল বোমা তৈরির উপকরণ হিসাবে মিলেছে কৌটো এবং ক্রিকেট বল।

৭ অক্টোবর, ২০১৪ : ঘটনাস্থল থেকে কিছু দূরে মঙ্গলকোটের শিমুলিয়ায় একটি মাদ্রাসার খোঁজ মেলে। সেখানে প্রশিক্ষণ দিতে নিয়মিত যেত রাজেরা বিবি এবং আলিমা বিবি। সেই সঙ্গে খোঁজ মেলে একটি সাইবার কাফের সেখানে রকেট লঞ্চার তৈরির নকশা প্রিন্ট করা হয়েছিল।

৮ অক্টোবর, ২০১৪ : খাগড়াগড় কাণ্ডের পর হাসনাবাদ থেকে জালনোট সমেত দুই বাংলাদেশী গ্রেপ্তার। এরাও জামাতের সদস্য বলে পুলিশের অনুমান। ফারুক হোসেন সরদার (২৫), সাদ্দাম হোসেন (২৭) নামে দুই ধৃত পাচারকারী এখন পুলিশের হেফাজতে।

মুর্শিদাবাদের রেজিনগর ও বেলডাঙা থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে। এক মৌলবি সহ ৬ জন গ্রেপ্তার। রেজিনগর থানার ওমরপুর মাদ্রাসার আনোয়ার খান নামে মৌলবি অস্ত্র ব্যবসায়ী বলে জানায় পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ২টি নাইন এম এম পিস্তল, ৬টি ওয়ান শটার, ১০ হাজার টাকার জাল নোট-সহ প্রচুর গুলি উদ্ধার।

১১ অক্টোবর, ২০১৪ : আরও এক জঙ্গিগোষ্ঠীর সন্ধান মিলল বর্ধমানের হাঁটুদেওয়ানে। এখানে খাগড়াগড় কাণ্ডে ধৃত কওসরের ভাড়াটে জঙ্গিরাই থাকত, ভাড়াটিয়া আলির শেখ পলাতক।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর থানার শাকা রেলগেটের কাছে বরাকর রোডে একটি টাটাসুমো থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার। প্রায় ১১০০ ডিটোনেটার, কিছু জিলেটিন স্টিক এবং ১০টি বস্তা বোঝাই পাওয়ার জেল উদ্ধার।

১২ অক্টোবর, ২০১৪ : মালদহের কালিয়াচক থেকে ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ২ লক্ষ টাকার জালনোট উদ্ধার।

মালদহ জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় বাজাপ্তি গ্রামে বোমা বিস্ফোরণ। স্থানীয় তৃণমূল কর্মী কামাল শেখের বাড়িতে এই বিস্ফোরণ। কামাল শেখ পলাতক।

পাণ্ডবেশ্বরের শ্যামলা পঞ্চায়েতে আলিনগর গ্রামে তৃণমূল নেতা ভীমসেন ঘোষের বাড়িতে বাইক বিস্ফোরণ। ডিটোনেটরের সঙ্গে তার সংযোগ করেই এই বিস্ফোরণ। এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

১৩ অক্টোবর, ২০১৪ : মঙ্গলকোটের শিমুলিয়ার মাদ্রাসা থেকে এন আই এ-র তল্লাশিতে উদ্ধার কিছু জিনিসসহ নথিপত্র। উদ্ধার পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বাংলাদেশের কিছু পুরুষ-মহিলার নাম, ফোনের ডায়েরি, বহু ফোন নম্বর, পোড়া কাগজপত্র, ৩টি মোবাইল ফোন, ৬টা সিমকার্ড, আরবি উর্দু অসমিয়া বাংলায় লেখা জেহাদি তালিমের বই, ল্যাপটপ, চার্জার, গ্রামোফোন রেকর্ড, ডঙ্গল, বিদেশি ব্যাঙ্কের পাশ বই, এয়ারগানের গুলি, ফুটো বোতল, অনেক নি-ক্যাপ, রোলার স্কেট, একজোড়া বক্সিং গ্লাভস, জামাকাপড়, গ্যাস সিলিন্ডার, একটি বড়ো তলোয়ার, চারটি খুকরি, সাদা পাউডার ভর্তি প্যাকেট, বালি বোঝাই বস্তা।

১৫ অক্টোবর, ২০১৪ : মালদহের কালিয়াচকে বিস্ফোরণ। কালিয়াচকের বীরনগর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতিচাপা গ্রামে বোমা বিস্ফোরণ। আহত এক কিশোর। জিয়াউল শেখের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে।

১৬ অক্টোবর, ২০১৪ : বাদশাহি রোডের মটরপাড়ায় রেজাউল শেখের বাড়িতে তল্লাশি। ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড ২৫টি বিস্ফোরক ভর্তি ব্যাগ, ৫০টি তাজা হ্যান্ড গ্রেনেড এবং ৫টি সকেট বোমা উদ্ধার করে।

১৭ অক্টোবর, ২০১৪ : ১৬টি তাজা বল বোমা উদ্ধার। কালিয়াচকের ষোলো মাইল এলাকার বাঁশবাগান থেকে এই বোমা উদ্ধার হয়।

১৯ অক্টোবর, ২০১৪ : লালগোলার এক অনুমোদনহীন মাদ্রাসায় তল্লাশি চালায় এন আই এ। সেখান থেকে নম্বরহীন দু'টি বাইক, সিমকার্ড এবং পুরানো নথি পোড়া অবস্থায় উদ্ধার। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মোফাজ্জল হোসেনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

যে মাদ্রাসাগুলির নাম জড়িয়েছে সেগুলি বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার। লালগোলার ময়া পঞ্চায়েতের মোকিমনগরের মাদ্রাসাও ছিল জঙ্গিদের ডেরা। এছাড়াও বীরভূমে বোলপুর থানার মুলুক গ্রামে এক রহস্য বাড়িতে ছিল জঙ্গিদের যোগসাজস। ■

বিহার থেকে মধ্যপ্রদেশ

প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বেআইনি অস্ত্র তৈরির রমরমা

শুভাশিস রায়॥ বছর ১০-এর ছেলেটিকে সকলে স্কুলছাত্র হিসাবেই জানত। কিন্তু কখন যে সে মিশে গেছে সন্ত্রাসবাদীদের ভিড়ে ঘুণাক্ষরেও তা কেউ টের পায়নি। ৪ মে, ২০১৪ তারিখে অজয় আলওয়া নামে এই পাচারকারী দিল্লী পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়। মধ্যপ্রদেশের ধার এলাকার বাসিন্দা অজয় উত্তরপ্রদেশের এক ক্রেতাকে পিস্তল পাচার করছিল। তখনই পুলিশ তাকে হাতেনাতে আটক করে। পুলিশী জেরায় জানায়, তনমন সিং নামে এক ব্যক্তির হয়ে সে কাজ করে। মধ্যপ্রদেশের কারওয়ানি থেকে এই বেআইনি অস্ত্র পাচার করত সে। এর আগে আগ্রা, মথুরা, মিরাট এবং দিল্লীতেও বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাচার করেছে অজয়। যার পারিশ্রমিক বাবদ প্রতিটি পিস্তল পিছু তার আয় ছিল ৩ হাজার টাকা। বে-আইনি অস্ত্র পাচারের কাজে এটা শুধুমাত্র সন্ত্রাসবাদের হিমবাহের চূড়া মাত্র।

বিহার এখন বেআইনি অস্ত্র কারখানার আঁতুড়ঘর। বর্তমানে বিহারের মুঙ্গের ছাড়াও দেশের অনান্য রাজ্যগুলিতেও যার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, বিহারে বেআইনি অস্ত্রের রমরমা থাকলেও মধ্যপ্রদেশেও এর জাল ক্রমশ বিস্তার হয়েছে। সম্প্রতি এমনই এক তথ্য উঠে এসেছে। যেখানে লক্ষ্য করা গেছে, মধ্যপ্রদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় তৈরি এই সমস্ত বেআইনি অস্ত্র দেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী-সহ কাঁটাতারের ওপারের দুষ্কৃতীদের হাতেও খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে। ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যেমন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন বা জামাত-উল-মুজাহিদিনের হাতে দেশি প্রযুক্তিতে তৈরি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছেছে। এমনকী মাওবাদীদের কাছে এইসব আগ্নেয়াস্ত্রের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব লক্ষ্য করা গেছে বলে জানা যায়।

দেশের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে এমন বেশ কিছু রাজ্যের নাম উঠে এসেছে যেখানে

অস্ত্রের বিপুল চাহিদা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, বিহারের কারখানাতে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র পাঠানো হয় দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গে। মেওয়াত এবং নুহ হরিয়ানার উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। কারণ এখানে সব থেকে বেশি বেআইনি অস্ত্র আমদানি করা হয় যা সবই আসে মধ্যপ্রদেশ থেকে। হরিয়ানার পাশাপাশি রয়েছে রাজধানী দিল্লীর নামও। বেআইনি অস্ত্র বিক্রির বাজার হিসাবে পরিচিত দিল্লী। বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে আসে এই সমস্ত অস্ত্রসামগ্রী। মহারাষ্ট্র বর্ডারকে কাজে লাগিয়ে মধ্যপ্রদেশ থেকে আসা অস্ত্র খুব সহজেই পাচার করা হয়ে থাকে বিভিন্ন রাজ্যে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারকে টেক্কা দিচ্ছে উত্তরপ্রদেশও। এখানে গড়ে উঠেছে বেআইনি অস্ত্রের সম্ভার। মাও অধ্যুষিত ঝাড়খণ্ডেও আগ্নেয়াস্ত্রের আনাগোনা বিপুল। এখানকার ঠিকাদার ও ব্যবসায়ীরা নিজেদের মাওবাদীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সঙ্গে রাখেন এই সমস্ত দেশীয় অস্ত্র।

বিহার, মধ্যপ্রদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। হাওড়া শহরের অলিতে-গলিতে গজিয়ে ওঠা লেদ মেশিনের কারখানাতে তৈরি হচ্ছে পিস্তল। যা খুব সহজেই চালান হয়ে যায় দুষ্কৃতিপ্রবণ এলাকাগুলিতে। গত বছর দিল্লী পুলিশ এবং হাওড়া সিটি পুলিশের যৌথ অভিযানে এমনই এক রমরমা ব্যবসার হদিশ মেলে হাওড়া শহরের বুকে। ২৪ মার্চ, ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে মালদহের কালিয়াচকে বেআইনি অস্ত্র কারখানার খোঁজ মেলে। যেখানে মুঙ্গেরের ব্যবসায়ী মহম্মদ ইমতিয়াজ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে দু'টি অর্ধসমাপ্ত সাত এম এম পিস্তল, দু'টি ড্রিল মেশিন, দু'টি লেদ মেশিন, লোহার পাইপ-সহ আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ২২ আগস্ট ২০১৪, ক্যানিংয়ের বাবুই ঝাঁকা গ্রামে এক অস্ত্র তৈরির কারখানার সন্ধান মেলে। যেখান থেকে ৯৫ রাউন্ড গুলি, ৬৯টি কার্তুজ, ২৯টি ডবল বোর কার্তুজ-সহ মেলে বোমা তৈরির মশলা এবং বন্দুক তৈরির সরঞ্জাম । এছাড়াও সম্প্রতি ঘটে যাওয়া লোমহর্ষক খাগড়াগড় কাণ্ড নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে বেআইনি অস্ত্র নির্মাণে এখন মধ্যপ্রদেশের জুড়ি মেলা ভার যা অস্ত্র নির্মাণের নতুন স্থান হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছে। প্রধানত এখানকার শিকলিগার সম্প্রদায় অস্ত্র পাচার করে চলেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

মধ্যপ্রদেশের বারওয়ানি, খারগোঁ, উমেরটি, বারিয়া, বুরহাসপুর- সহ আরও

অনেক জায়গা রয়েছে যেগুলি বেআইনি অস্ত্রের আখড়া হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এখনকার দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি পিস্তল বা 'কাট্টা' (হিন্দিভাষীদের কাছে যে নামে পরিচিত) বিহারের মুঙ্গের-সহ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ, আলিগড় এবং মীরাটে খুবই জনপ্রিয়। মধ্যপ্রদেশের গ্রামগুলিতে তৈরি হওয়া বেআইনি অস্ত্রের চাহিদাও রয়েছে দিল্লী, মুম্বই, পুনে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে। এই বিষয়ে সেন্ট্রাল সিকিউরিটি এজেন্সির দাবি, মধ্যপ্রদেশের এই সমস্ত গ্রামগুলিতে শিখ সম্প্রদায়ের ২০০-৩০০ পরিবার বংশপরম্পরায় ছুরি, শোর্ড, বন্দুক তৈরির কাজে বেআইনিভাবে যুক্ত। প্রতিমাসে তারা আনুমানিক ১ হাজার পিস্তল তৈরি করে থাকে। এক একটি অস্ত্রের দাম ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা।

অস্ত্র পাচার হয় ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সের ছেলেদের হাত ধরে। ২৭ জুন, ২০১৪ অলিগড়ের বাসিন্দা রমেশ চন্দ এবং প্রেমপাল পিস্তল পাচার করতে গিয়ে দিল্লী পুলিশের জালে ধরা পড়ে। ২০টি পিস্তল গাড়ির ব্যাটারির বাক্স করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের চোখে ধুলো দিতে ব্যর্থ হয়। জানা যায়, মধ্যপ্রদেশের খাড়গোঁ জেলার সিগনোরে তৈরি হওয়া এই সমস্ত পিস্তল বানাতে ৮ হাজার টাকা খরচ হলেও পরে তা বিক্রি হয়েছিল ১৮ হাজার টাকায়। এরকমই আর এক ঘটনা ঘটে গত ১৩ জুলাই। ১০টি পিস্তল এবং ১০টি স্পেয়ার ম্যাগাজিন বন্দুক পাচার করতে গিয়ে দিল্লী পুলিশের ফাঁদা জালে পা ফেলে পাঁচ পাচারকারী। ধৃতদের মধ্যে দীনেশ নামে এক পাচারকারী জানায়, মীরাটের বাসিন্দা খিলাফত নামে এক ব্যক্তির কাছে এই সমস্ত অস্ত্র পাচার করা হচ্ছিল।

এইভাবে বেআইনি অস্ত্রের রমরমা বেড়ে চলেছে সারা দেশ জুড়ে। এমনই এক আশ্চর্যজনক তথ্য উঠে এসেছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর সূত্র মারফত। জানা যাচ্ছে, দেশে ক্রমশ বাড়ছে বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহার। প্রতি ১০০ জন মানুষের পিছনে রয়েছে তিনটি করে বন্দুক। অর্থাৎ ইউ এস-এর পর ভারত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশ যেখানে ব্যক্তিগত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারী রয়েছে।

বিহারের মুঙ্গের এক্ষেত্রে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির পরম্পরা জারি রেখেছে। এই সমস্ত অস্ত্র উত্তর-পূর্ব এবং জম্মু এবং কাশ্মীর বর্ডার দিয়ে পাচার হয়ে থাকে। জানা যায়, ২০১৩ সালে সরকারি লাইসেন্স বিহীন বন্দুকের গুলিতে প্রাণ গেছে বিহারের ৭৫৫ জন মানুষের এবং উত্তরপ্রদেশে ১৬১৯ জনের। পাশাপাশি লাইসেন্সধারী বন্দুকের গুলিতে বিহারে ১১ জন এবং উত্তরপ্রদেশে ১২৪ জনের প্রাণ যায়। অর্থাৎ যথেচ্ছহারে বেআইনি অস্ত্র ব্যবহারের চিত্র পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। দেশি পদ্ধতিতে তৈরি এই সমস্ত বেআইনি পিস্তলের এক একটির দাম যেখানে ৬০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা, সেখানে নাইন এম এম চাইনিস পিস্তলের দাম পড়ে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। সারা দেশ যে বারুদের স্তূপের উপর অবস্থান করছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

পিস্তল তৈরি এবং পিস্তলের ব্যবহার সম্বন্ধে গুরুদেব সিং নামে এক অস্ত্র ব্যবসায়ী জানায়, 'বন্দুক তৈরির ক্ষেত্রে লোহার পাইপকে কাজে লাগানো হয়। যা ভালো বন্দুক বানাতে সাহায্য করে। এছাড়াও অন্যান্য সামগ্রী যেমন স্প্রিং, নাটবল্টুও খুব সহজেই মেলে। এ সম্বন্ধে দীনেশ চৌহান নামে এক মধ্যস্থতাকারী জানায়, কয়েকবছর আগে পর্যন্ত অস্ত্র ভাড়ায় পাওয়া যেত। কিছু টাকা ডিপোজিট হিসাবে জমা দিয়ে সাময়িকভাবে ভাড়ায় নিয়ে যেত অস্ত্র। বন্দুক ভাড়ায় পাওয়া গেলেও গুলি কিনতে হোত। কাজ শেষ করে বন্দুক জমা দিলে ওই জমা করা ডিপোজিটের টাকা ফেরত পাওয়া যেত। কিন্তু এখন ওই দেশি বন্দুকে মেড ইন ইংল্যাণ্ড বা মেড ইন চায়না সেঁটে দিলেই দ্বিগুণ দামে তা বিক্রি হয়।

অস্ত্র তৈরির মতো বেআইনি ব্যবসা থকে বেরিয়ে আসতে চাইছে অনেকেই। সুদান সিং আলিয়াস বাবা নামে বারিয়ার এক শিখ অস্ত্র ব্যবসায়ী পিস্তল তৈরির কাজ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। তার দাবি, স্থানীয় পুলিশ এই কাজ করতে বাধ্য করে অর্থাৎ বকলমে তারাই দুষ্কৃতিদের মদত যোগাচ্ছে।

পুলিশী কড়াকড়ি এবং বেআইনি অস্ত্র আইন মামলায় কমপক্ষে ছয় মাসের জেল। তাই তারা বেআইনি অস্ত্র আর তৈরি করতে চাইছে না। সরকারের কাছে তাদের দাবি, সরকার যদি একটা কারখানা খোলে তাহলে তারা সেখানে কাজ পায়। এ প্রসঙ্গে তাদের যুক্তি, কাজ পেলে অস্ত্র তৈরির সঙ্গেও যুক্ত থাকা যায়, আবার জেলে যাওয়ার হাত থেকে বা শাস্তির হাত থেকে মুক্তিও মেলে। ■

Jagan

JLI

JANANI LOGISTICS OF INDIA

(Every Thing is Possible in India)

H.P.L. Link Road, Back Side of SAB NURSING HOME
Haldia - 721 602 (W. B.)
Cell : 09932367874, 09333824694,
Telefax : 03224-272074
E-mail : jananilogisticsofindia@gmail.com

আমাদের অমলদা

প্রদীপ ঘোষ

এখনকার স্বয়ংসেবকরা হয়ত জানেন না অমলদার একটা ডাকনাম ছিল। টিপু। অমলদা তখন প্রান্ত প্রচারক। ছাব্বিশ নম্বরে থাকেন। একবার বিজয়া দশমীর পরদিন সকালে আমরা কয়েকজন স্বয়ংসেবক ছাব্বিশ নম্বরে গেছি। অমলদা বললেন, বিজয়া করবে, তাহলে আমার সঙ্গে চল। ছাব্বিশ নম্বরের উল্টো দিকেই বোস কোম্পানির খুব পুরনো ওষুধের দোকান ছিল। ওপরে মালিকরা থাকতেন। মালিক অমলদার মেসোমশাই। আমরা যেতেই অমলদার মাসতুতো বোনেরা বলে উঠল, মা, টিপুদার সঙ্ঘের দাদারা এসেছেন। মাসীমা যত্ন করে জলযোগ করালেন। এই প্রথম অমলদার মাসীমার বাড়ি গেলাম। তারপর যতবারই গেছি আপ্যায়ন করেছেন।'

অমলদা যখন প্রথম প্রচারক হয়ে কলকাতায় এলেন তখন আমরা স্কুলের ছাত্র। গোয়াবাগানের স্বয়ংসেবক। আমাদের শাখাতে একদিন এলেন আরও কয়েকজন অধিকারীর সঙ্গে। তিনি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে এসেছিলেন। হিন্দী ও মারাঠী ভাষা খুব ভাল বলতেন। কিন্তু প্রথম দিনেই লক্ষ্য করলাম তিনি ধুতি পরেন বাঙ্গালিদের মতোই কোঁচা ও কাছা দিয়ে। মারাঠীদের মতো মালকোঁচা মেরে নয়। আর ওঁর কথাতেও কোনো অবাঙ্গালি টান নেই, যেটা অন্য প্রদেশাগত বাঙ্গালি প্রচারকদের কথায় দেখেছি।

অমলদাদের আদি বাড়ি ছিল (এবং এখনও আছে) ডায়মন্ড হারবারের কাছে কলাগাছিয়ায়। ইন্দোরের কাছে ধার নামে একটি ছোট দেশীয় রাজ্যের রাজার ব্যক্তিগত সচিব হিসাবে কাজ করার জন্য অমলদার বাবা ধারে যান এবং ওখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি ওখানে ওকালতি করতেন। সত্তরের দশকের প্রথম দিকে আমি একটা কাজে ইন্দোর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে একদিন বাসে করে ধার গেলাম। অমলদার বাড়িতে গিয়ে মায়ের হাতের রান্না খেলাম। বাড়িটা মাটির তৈরি দোতলা। কিন্তু খুব শক্তপোক্ত। অমলদার বাড়িতে দেখলাম আলমারি ভর্তি বাংলা বই। প্রবাসী, ভারতী ইত্যাদি পত্রিকার বাঁধানো সংস্করণ। তখন বুঝলাম বাংলা থেকে দূরে থেকেও এঁরা বাংলার চর্চা বজায় রেখেছেন। সেজন্যই অমলদার বাংলা এত ভাল।

আমার দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল অমলদার সঙ্গে একসঙ্গে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে শিক্ষাগ্রহণের। ১৯৫৪ সাল। বিহারের গয়ায় দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার জন্য গেলাম। অসম, বাংলা, ওড়িশা ও বিহারের মিলিত সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ। অমলদা ও আমি একই গণে ছিলাম। ওই বৎসর বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ওই বর্গে শিক্ষার্থী হিসেবে ছিলেন। যেমন দার্জিলিং-এর প্রচারক বংশীদা। কলকাতার অ্যাডভোকেট শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্যামচাঁদ মল্লিক, হাওড়ার নারায়ণ মল্লিক প্রমুখ। তখন সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ হোত তিরিশ দিনের। অমলদা তখন প্রান্ত প্রচারক। তাই বৌদ্ধিক শিক্ষা নিতে হয়নি ওঁকে। তিনি কেবল শারীরিকের ক্লাস করতেন। বৌদ্ধিকের সময় অধিকারীদের সঙ্গেই বসতেন। চর্চা নিতেন, বৌদ্ধিক দিতেন ইত্যাদি। শারীরিকের সময় মজা হোত খুবই। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন অসমের প্রান্ত প্রচারক ঠাকুর রামসিংজী ও ওড়িশার প্রান্ত প্রচারক বাবুরাও পালধিকরজী। এখন এঁরা ছিলেন তো অমলদার বন্ধু। তাই শারীরিকের পরীক্ষা নিতে এসে ওঁরা অমলদাকে বলতেন, আজ এমন কঠিন পরীক্ষা নেব, দেখবেন। অমলদা বলতেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি জিজ্ঞাসা করবেন, করুন না। এক্ষুনি করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখি কি করে আমায় ফেল করান। কেশবজী ছিলেন আমাদের গণ শিক্ষক। ওই সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে আমাদের একটা সিনেমা দেখানো হয়েছিল যাতে দেখলাম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজনীয় ডাক্তারজী সঙ্ঘস্থানে এসে ধ্বজ তুললেন। আবহ সঙ্গীত বাজছিল ''জয় স্বদেশ জয় সংস্কৃতি মাতা।'' ডাক্তারজীর স্থির চিত্র তো কতই দেখেছি। সচল চিত্র এই প্রথম। ডাক্তারজীর যে সচল চিত্র তোলা হয়েছিল তা তখনও জানতাম না।

প্রান্ত কার্যবাহ থাকার সময়ে অমলদা একবার উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন। আমি তখন উত্তরবঙ্গে প্রচারক ছিলাম। ষাটের দশকের কথা। আমরা কয়েকজন স্বয়ংসেবক নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। অমলদা নামার পরেই জানতে পারলেন যে ওঁর মানিব্যাগ পকেটমার তুলে নিয়েছে। তারপর আমি ও অমলদা শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, কালিংপং ও চ্যাংড়াবান্ধায় ভ্রমণ করলাম কয়েকদিন ধরে। ফেরার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে আমরা ওঁর ফেরার টিকিট কেটে দিলাম এবং ওঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে পথ খরচ বাবদ কিছু টাকা পকেটে গুঁজে দিলাম। পরে আমি প্রান্ত প্রচারক বসন্তদাকে চিঠিতে লিখেছিলাম যে উত্তরবঙ্গে এসে ওঁর খুব ক্ষতি হয়ে গেল। বসন্তদা তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেননি। কয়েক মাস পরে বসন্তদার সঙ্গে কথা হওয়ার পরে জানতে পারলাম যে অমলদা মানিব্যাগ হারানোর ব্যাপারে কাউকেই কিছু বলেননি।

একটু ব্যক্তিগত ঋণের কথায় আসি। আমি স্থির করেছিলাম যে বাংলায় অনার্স এবং এম এ করব। তিনি জানতে পেরে বললেন, না, তুমি ইংরাজি নিয়ে অনার্স ও এম এ কর। আমি বললাম, অমলদা, ইংরাজিতে পারব? তিনি বললেন, খুব পারবে। অমলদার আশীর্বাদ খেটে গিয়েছিল। বিএড পড়ার সময় অমলদার কাছে বিএডের বই চাইতে গিয়েছিলাম। তিনি আলমারির চাবিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। আমি আটখানা বই বার করে বললাম, অমলদা বইগুলোর একটা লিস্ট করে দিয়ে যাব। তিনি বললেন, কোনো দরকার নেই। পরীক্ষা হয়ে গেলে বইগুলো ফেরত দিয়ে যেও।

অমলদা চিঠির শেষে লিখতেন, ইতি তোমাদের অমলদা। এই 'তোমাদের অমলদা' কথাটা খুবই ভাল লাগত। যেন নিমেষের মধ্যে কাছের মানুষের মতো টেনে নিতেন। অমলদা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। ■

অমলদার সান্নিধ্যে কিছুদিন

ডাঃ শম্ভুনাথ ধাড়া

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় অমলদাকে (৺অমলকুমার বসু) ২৬নং বিধান সরণি, কলকাতা-৬-এ প্রথম দেখি। সঙ্গে ছিলেন ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজ। তিনি তখন হুগলী বিভাগ সঙ্ঘচালক ছিলেন। অমলদা ছিলেন খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। প্রথম দর্শনে মানুষটাকে খুবই কঠিন বলে মনে হোত। কিন্তু কথা বলার পর তাঁর দরদি মনের পরিচয়টা পাওয়া যেত। ১৯৮১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অমলদার সান্নিধ্য লাভ করেছি। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি। অমলদার নাম করলেই আর একটি নাম এসে পড়ে, তিনি তৎকালীন সহ-প্রান্ত প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত। এই জুটি কীভাবে বাংলার মাটিতে সঙ্ঘকাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা তখনকার অনেক কার্যকর্তা জানেন।

অমলদার বৌদ্ধিক শোনার ভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা ভাগ্যবান। কারণ অমলদার বৌদ্ধিক শোনার সময় কোনো ক্লান্তি আসত না। বৌদ্ধিক শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শোনার প্রবল ইচ্ছা থাকত। আজকাল যেমন কথা শোনার ধৈর্য বেশি থাকে না, অমলদার ক্ষেত্রে তা ছিল পুরো উলটো।

২৬ নং কার্যালয়ের অনেক ঘটনা মনে পড়ে। রোহিণীদা (প্রামাণিক) কার্যালয় প্রমুখ, আমি সহ-কার্যালয় প্রমুখ। অমলদা প্রতিদিন সকালে নব ব্যারাকপুরে কলেজে যেতেন, ফিরতেন সন্ধের সময়। ফিরতেন কোনো না কোনো খাবার নিয়ে। তখন সঙ্ঘের এতটা সচ্ছল অবস্থা ছিল না। তখন মনে হোত আমাদের পরিবারের কর্তা ফিরে এলেন আমাদের জন্য কিছু নিয়ে। অমলদার শরীর খারাপ হওয়ায় চিকিৎসক দুধ খেতে বলেছিলেন। তখন দুধের কল্পনা করা খুব কঠিন ছিল। কিন্তু অমলদা দুধ একা কী করে খাবেন? তাঁর মন যে সকলের জন্য কেঁদে ওঠে। তাই তিনি ছোট পাথর বাটিতে সবার জন্য দুধের ব্যবস্থা করেই নিজে দুধ খেলেন।

একবার ভাতের প্রশ্ন উঠল। কারণ কার্যালয়ে রেশনের মোটা চালে ভাত হোত। গন্ধ থাকত। ভাল স্বাদের হোত না। তাই অনেকের ভাল লাগত না। এই কথা অমলদার কানে গেল। একদিন খেতে খেতে অমলদা বললেন, ''দেখ বাপু, সারা কলকাতার সাধারণ নাগরিক এই রেশন চালের ভাত খায়। তাই তাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে বরং এক ইঞ্চি নীচে আমাদের থাকতে হবে। মানুষের দুঃখে আমাদের সহভাগী হয়ে কাজ করতে হবে, সংগঠন তবেই হবে।'' তবে অমলদা বলতেন— কারও যদি মুখে রুচি বদল করতে হয়, এক আধদিন বাইরে খেয়ে আসতে পার।

২৬নং এর উল্টো দিকে এক গুজরাটি পরিবার থাকত। সেখানে একটা ছোট ছেলে কাজ করত। প্রায়ই দূর থেকে দেখতাম। একদিন শাখা থেকে ফিরে নীচে বসে আছি, ওই ছেলেটি এল আমার কাছে। বলল, আপনি শাখা করেন? বলি— হ্যাঁ। তুই কী শাখায় যাস। ছেলেটি বলল, আমাদের গ্রামের শাখাতে যেতাম। বললাম, এখানে কী করিস? বলতেই কান্নাকাটি শুরু করল। বলল, ওই বাড়ি কাজ করি। আমাকে ভাল খেতে দেয় না। মারে। তখন বললাম, আমাদের কার্যালয়ে কাজ করবি? ছেলেটি বলল— হ্যাঁ করব। অমলদাকে তা বলতেই তিনি বলল, আজকেই নিয়ে এস। পরে তাঁর দিদির সঙ্গে কথা বলে ছেলেটিকে রাখার ব্যবস্থা হয়। লেখাপড়া (স্কুলে নয়) শিখে পরে ছেলেটি তার গ্রামের বাড়িতে ভালো ভাবে জীবনযাপন করছে।

অমলদার পৈতৃক বাড়ি সরসুনাতে। তাঁদের পরিবারের রেওয়াজ অনুযায়ী প্রতি বছর দশমীর দিন বাড়ির যত বয়স্ক কাজের লোক থাকতেন তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হোত। আমাদের বলতেন, সব মানুষের স্থান উচ্চে। কেউ ছোট নয়। তাই ২৬ নং-এ যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের কাজের লোক হিসাবে দেখা হোত না।

১৯৮২ সালে অমলদার বেহালার বাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁর বাবাকে দেখতে। তিনতলায় ১টি ঘরে অসুস্থ অবস্থায় খাটে শুয়ে আছেন। বাবার মাথার কাছে বসে আছেন অমলদার মা। প্রণাম করতেই অমলদার বাবা আমাকে বললেন— কি নাম? নাম বললাম। কি করা হয়? বললাম সঙ্ঘের প্রচারক। তিনি বললেন, কত দিনের জন্য সঙ্ঘের কাজে বেরিয়েছ? বললাম, দু'বছরের জন্য। বললেন, হ্যাঁ দু'বছর পর ফিরে যেও। ওই আমার টিপু (অমলদার ডাক নাম) অনেক লেখাপড়া শিখেছে। যা জ্ঞান ছিল বিশ্বের একজন হতে পারত। কিন্তু ওই সঙ্ঘে যে সেই গেল আর তা হতে পারল না। অমলদার মা ইশারায় কথা বলতে বারণ করলেন।

একবার পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থেকে পুজোর সময় ৫৫ জন বনবাসী ছাত্রকে কলকাতার পুজো দেখার জন্য নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে যারা একটু বয়সে বড় এমন ৩০ জন ২৬নং-এ ছিল। অমলদা তাদের পরিচয় নিচ্ছিলেন— নাম, ধাম ইত্যাদি। ছাত্রাবাসে কী কী খাওয়া হয় তার পুরো বিবরণ জানছিলেন। সকালে কি খাবার থাকে, জলযোগে? ছাত্রের উত্তর— পান্তাভাত। অমলদা আবার জিজ্ঞাসা করেন— নুন লঙ্কা থাকে কি না? আলুভাতে থাকে কি না? জানতে পারলেন— এসব কিছুই থাকে না, শুধু নুন দিয়ে ভাত। রাতে ডিবে (লম্ফ) জ্বেলে পড়ে, তাও তেল থাকে কি না প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করলেন। এসব শোনার পর অমলদা একেবারে কেঁদেই ফেললেন। কত কষ্ট বনবাসী ছাত্রদের!

১৯৮৪ সালে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি গঠিত হলো। তিনি ছিলেন তার সভাপতি। একটু নিয়মের বাইরে গেলে তিনি ছেড়ে দিতেন না। কেশব ভবন নির্মাণের সময় একবার কর্পোরেশনের ট্যাক্স অফিসার এসে আমাকে বলেছিলেন, যদি বাড়তি কিছু টাকা দেন তো ট্যাক্স অনেক কমে যাবে। এই কথা শোনামাত্র অমলদা বললেন, লোকটাকে বেঁধে রাখলে না কেন?

অমলদার জীবনে সঙ্ঘকাজই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল। বাড়িতে প্রাচুর্য থাকতেও ত্যাগের বেদিকায় নিজেকে তিলে তিলে জ্বালিয়ে দেশমাতৃকার চরণে সমর্পণ করেছেন।

চা-বিক্রেতার মেয়ে মঞ্জুবালার স্বপ্ন পূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বপ্ন পূরণ হলো চা-বিক্রেতার মেয়ের। দরিদ্র ও অভাবী সংসারের মেয়ে মঞ্জুবালা দক্ষিণ কোরিয়ার ইঞ্চিয়োনে শহরে ১৭তম এশিয়াড গেমসে মেয়েদের হ্যামার থ্রো প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক জয় করে বাবারও স্বপ্নপূরণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারত তথা রাজস্থানের নামও উজ্জ্বল করলেন। রাজস্থানের চুরু জেলার রাজগড় খেলায় অংশগ্রহণ এবং প্রথম বারেই তিনি দেশের জন্য পদক জয় করলেন।

মঞ্জুবালার জন্ম ১৯৮৯ সালের ১ জুলাই। প্রথম প্রয়াসেই তিনি ৬০.৪৭ মিটার দূরত্বে হ্যামার নিক্ষেপ করতে সমর্থ হন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত প্রদর্শন ৬২.৭৪ মিটারের। এটা তিনি করেন এ-বছরের জুন মানে লখনউতে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করে।

মঞ্জুবালার বাবা বিজয় সিংহ চাঁদগোঠী বাসস্টান্ডে একটি চায়ের দোকান চালান। এর থেকে ঘরের খরচ চলে। সংসারের আর্থিক স্থিতি খুবই দুর্বল হলেও মেয়ের স্বপ্নকে তিনি কখনো কম হতে দেননি। তিনি বলেন— ‘‘মঞ্জুর সফল্যের ক্ষেত্রে আমার থেকে ওঁর মায়ের ভূমিকাই বেশি। মা সন্তোষদেবী লেখাপড়া জানেন না, তা সত্ত্বেও মঞ্জুকে তিনি সবসময় উৎসাহিত করেছেন। সত্যি বলতে কী, একজন মা-ই মেয়েকে বাইকে পাঠাতে পারেন, বাবার এরকম সাহস হয় না। এজন্যই আমার মেয়ে মঞ্জু ইঞ্চিয়োনে তার স্বপ্নপূরণ করেছে। মঞ্জুবালা জাতীয়স্তরে অনেক রেকর্ড তৈরি করেছেন। প্রায় দু'ডজন স্বর্ণপদক তাঁর ঘরে সাজানো আছে। কিন্তু এশিয়াডে এই প্রথম তাঁর পা রাখা।

মঞ্জুর বাবা অভাবের দিনগুলোর কথা মনে করে বলেন, ‘‘অনেকবার এরকম হয়েছে মেয়েকে টুর্নামেন্ট বা ট্রেনিং-এ পাঠানোর জন্য গ্রামের লোকের কাছে ঋণ করতে হয়েছে। সেজন্য আমার কোনো আপশোস নেই। কেননা মেয়ে এমন কাজ করেছে যার সামনে এই ঋণ কোনো ব্যাপার নয়।’’

আসলে মঞ্জুবালা ভলিবল দিয়ে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছেন। একটা টুর্নামেন্টে তাঁকে বাইরেও যেতে হয়েছিল। সেখানে তিনি প্রথমবার হ্যামার থ্রো দেখেন। সেখান থেকে ফিরে হ্যামার থ্রো শুরু করেন। এরপর আর তাঁকে পিছনে তাকাতে হয়নি।

নিজের বিষয়ে মঞ্জুবালা বলেন, তাদের গ্রামে এমন কোনো মাঠ ছিল না যেখানে তিনি হ্যামার থ্রো অভ্যাস করতে পারেন। এজন্য সময় পেলেই তিনি গ্রামের বাইরে কাঁচা রাস্তায় অভ্যাস শুরু করেন। অভ্যাস করতে দেখে পথচারীরা তো হেসেই আকুল হোত। কেউ কেউ আবার রাস্তায় এভাবে অভ্যাস করার বিরোধিতা করতো। কিন্তু তিনি এসব ভ্রূক্ষেপের মধ্যেই আনেননি। ২০০৫ সালে তিনি জাতীয় দলে নির্বাচিত হন এবং স্বর্ণপদক জয় করেন। এই জয়ই তাঁর ভাগ্য খুলে দেয়, যার জন্য আর পিছনে তাকাতে হয়নি। ২০১২ সালে তিনি আমেদাবাদ রেলওয়েতে করণিকের চাকরি পান। তার দু' বছর আগেই অবশ্য তাঁর বিয়ে হয়েছে। স্বামী সেনাকর্মী রাকেশ কুমার মঞ্জুবালাকে উৎসাহই দিয়েছেন। তাই বিয়ের পরও তিনি অভ্যাস চালিয়ে গিয়েছেন।

রাজস্থানের চুরু জেলার ছোটগ্রামের মেয়ে ও ঝুনঝুনু জেলার লাডুন্দা গ্রামের বধূ মঞ্জুবালা গত দশ বছরে জাতীয় ও অন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতায় আজ পর্যন্ত প্রায় দু'ডজন গোল্ড মেডেল জিতেছেন। ২০০৫ থেকে মেডেল পাওয়া শুরু হলেও তাঁর সবচেয়ে বড় জয় এশিয়াডে রৌপ্যপদক জয়ের মাধ্যমে হয়েছে। এ জয় তাঁর বিয়ের দু'বছর পর হলো। মেডেল পাওয়ার পর মঞ্জুবালা বলেন তিনি অনেকবার অন্তর্রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতায় দেশ ও প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, কিন্তু এবার ইঞ্চিয়োন এশিয়াডে রৌপ্যপদক জিতে বেশি খুশি এবং ভবিষ্যতেও তিনি আরো পদক জয় করতে চান।

ইঞ্চিয়োনে পদক জিতে দেশকে গৌরবান্বিত করার পর মঞ্জুবালা বলেন, ‘‘অভিভাবকদের খেলাধুলোর এমন পরিবেশ নির্মাণ করতে হবে যে ছেলেমেয়েরা কোনো দ্বিধা না করে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে পারে। হরিয়ানা সরকারের মতো রাজস্থানেও খেলাধূলার জন্য উৎসাহের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। ‘পদক লাও, পদ পাও’ যোজনা শুরু করা প্রয়োজন। কোনো যুবপ্রতিভা সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত যেন না হয়।’’

এশিয়াড গেমসে বিজয়ী জাতীয় পতাকা হাতে মঞ্জুবালা।

মঞ্জুবালার আগামী লক্ষ্য ২০১৬ সালের অলিম্পিকে ভারতকে স্বর্ণপদক এনে দেওয়া। ■

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার, গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

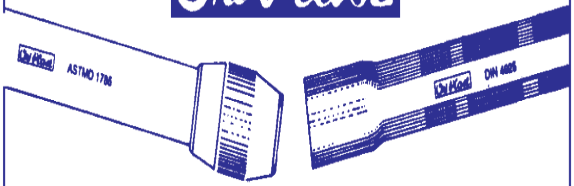

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"হিন্দু ধর্মের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল, নূতন নূতন মতবাদ সৃষ্টি করার শক্তি এবং অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের স্মৃতি সংরক্ষণ। এই দুইটি দৃঢ়ভাবে রক্ষার ভার চিরকাল এদেশের নারী ও জনসাধারণের উপর ন্যস্ত হয়েছে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজনে একটি চিরকালীন বই

ভিক্ষুদেব ভট্ট

চরক সংহিতার বক্তা হলেন ভগবান আত্রেয় (স্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ) এবং শ্রোতা অগ্নিবেশ ঋষিগণ। যখন নারায়ণ মৎস্যাবতার রূপে বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব অথর্ববেদের অন্তর্গত আয়ুর্বেদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর অনন্তদেব চররূপে (ছদ্মবেশে) পৃথিবীতে উপস্থিত হয়ে দেখেন পৃথিবীর লোক নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করছে। এতে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হওয়ায় তিনি ষড়ঙ্গ বেদবেত্তা মুনিপুত্র রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং চরক নামে খ্যাত হন। আয়ুর্বেদের অবতরণ বা ইতিহাস হলো প্রথমত, ব্রহ্ম ব্রহ্মসংহিতা নামে এক সংহিতা রচনা করেন। তিনি প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। দক্ষ অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। তাঁদের থেকে ভগবান ইন্দ্র, ইন্দ্র থেকে ভগবান আত্রেয়, ভরদ্বাজ এই শিক্ষা লাভ করেন। এর পর বহু পুণ্যকর্মা মহর্ষিগণ শুভ হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সমবেত হলেন। (সমেতা পুণ্য কর্ম্মানঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে (১/৩)) মহর্ষিদের সুচিন্তিত অভিমত হলো— আরোগিতাই ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। তাঁদেরই পরামর্শে ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হতে এই শিক্ষা লাভ করেন। এদিকে ভগবান আত্রেয়ও এই বিদ্যা তাঁর ছয় শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণিকে শিক্ষা দেন। তাঁরাও প্রত্যেকে নিজ নিজ নামে তন্ত্র রচনা করে আত্রেয় ও অন্যান্য ঋষিদের শোনান এবং অন্যান্য সমবেত ঋষিও তা অনুমোদন করেন। পণ্ডিতপ্রবর আয়ুর্বেদবেত্তা চরক এই সকল তন্ত্র সংগ্রহ ও সংস্কার করে নিজনামে 'চরক সংহিতা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ রচনাকালে তিনি ব্রহ্মা, প্রজাপতি দক্ষ, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় এবং অগ্নিবেশের নিকট যথাক্রমে সূত্র, শরীরস্থান, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি— এই অষ্টস্থল শিক্ষালাভ করেন।

প্রথম অধ্যায় দীর্ঘজীবিতীয় অধ্যায়ে ঔষধি ও চিকিৎসক শীর্ষকে বলা হয়েছে— মাথায় বাজ পড়েও রোগী বেঁচে থাকতে পারে তবু অজ্ঞের দেওয়া ঔষধ সেবনে রোগী বাঁচে না। (১/৫৮) উপযুক্ত ঔষধ তাহাই, যাহাতে আরোগ্য লাভ হয়। তিনিই উৎকৃষ্ট চিকিৎসক, যিনি রোগ হতে মুক্ত করতে পারেন। (১/৬২) এভাবে প্রথম চারটি অধ্যায়ে ঔষধের বিষয় বলা হয়েছে। এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ভগবান আত্রেয় 'চরক-সংহিতা' অগ্নিবেশ আদি শিষ্য, ঋষিদের সামনে ব্যাখ্যা করছেন, আবার শিষ্যেরাও প্রশ্ন করে বিষয়গুলির অর্থাদি জেনে নিচ্ছেন।

পরের চারটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু স্বাস্থ্যরক্ষা। পঞ্চম অধ্যায়ের নামই (মাত্রা+অশিত) মাত্রাশিতীয়ঃ। অর্থাৎ পরিমিত ভোজন। আহার বিষয়ক বিচারের শুরু— 'মাত্রাশী স্যাৎ, আহারমাত্রা পুনরগ্নিবলাপেক্ষিণী।' পরিমিত ভোজন হওয়া আবশ্যক। আহারের মাত্রা অগ্নির বল অপেক্ষা করে।... মাত্রানুযায়ী আহারে ভোক্তা অবশ্যই বল, বর্ণ, সুখ ও পরমায়ু লাভ করে। দাঁত মাজা, শরীরে তেল মাখা, স্নান, বসন পরিধান, গন্ধমাল্য, আভরণ, শৌচাদি, কেশাদি ছেদন, পাদুকা, ছত্র ও দণ্ড ধারণ প্রভৃতি এই অধ্যায়ে লিখিত। পরের অধ্যায়ে ষড় ঋতুচর্যা। সপ্তম অধ্যায়ে (ন বেগান্-ধারণীয়ঃ) মূত্র, মল, শুক্র, অধোবাত, বমি, হাঁচি, উদ্‌গার, হাই তোলা, ক্ষুধা, পিপাসা, অশ্রু, নিদ্রাদির বেগ ধারণ করা অনুচিত। বেগ ধারণে রোগাদি ও তার চিকিৎসা বর্ণিত।

এভাবে ৩০টি অধ্যায়ে 'সূত্রস্থান' আত্রেয় পুনর্বসু কথিত। মাঝে মাঝে কাশীপতি বামক, ঋষি মৌদ্‌গল্য, শরলোমা, বার্য্যোবিদ, হিরণ্যাক্ষ, শৌনক, ভদ্রকাপ্য, ভরদ্বাজ, কাঙ্কায়ন প্রভৃতি ঋষিদের বক্তব্য (প্রশ্নোত্তর) আমরা পাই; বিশেষ করে ২৫তম অধ্যায়ে রোগের উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা কালে।

অষ্টম অধ্যায় 'ইন্দ্রিয়োপক্রমণীয়ঃ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-চিকিৎসা বিষয়ক। এতে আছে পাঁচ ইন্দ্রিয়— দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসন ও স্পর্শন এগুলির জ্যোতি, আকাশ, ক্ষিতি, জল ও বায়ু হলো প-চ উপকরণ দ্রব্য। তাদের আশ্রয় স্থান পাঁচটি— অক্ষিদ্বয়, কর্ণদ্বয় ইত্যাদি। আবার এগুলির ভোগ্য বিষয় রূপ, শব্দ গন্ধ, রস ও স্পর্শ। তাদের আছে দর্শন, শ্রবণবোধ ইত্যাদি পঞ্চবোধ বা বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, মন ও আত্মা একযোগ হলে তত্তৎ বোধের উদয় হয়। এভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় সকল বলা হয়েছে যার দ্বারা মানুষ অব্যাধি হয়ে শতবর্ষ জীবিত থাকবেন শুধু নয় তিনি হবেন ধর্মাত্মা এবং সর্বভূতের বন্ধুতা লাভ করবেন। এজন্য সদ্‌বৃত্ত সকলেই অনুষ্ঠান করবেন, সদ্‌বৃত্তগুলি হলো সুস্থ মানুষ, সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য আচরণ বিধি।

পরের ৪টি অধ্যায়ে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে বলা হয়েছে। নবম অধ্যায় 'খুড্ডাকচতুষ্পাদঃ'। খুড্ডাক শব্দের অর্থ স্বল্প। প্রথমেই উল্লেখ আছে— চিকিৎসার চতুষ্পাদ— বৈদ্য, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী। এই প্রতিটি পাদেরই ৪টা করে গুণ— মোট ১৬টি গুণ বৈদ্যের থাকলে রোগারোগ্যের কারণ স্বরূপ হয়। দশম

অধ্যায় 'মহাচতুষ্পাদ' জানলে ঔষধের সফলতা লাভ করা যায়। তিনটি এষণা— প্রাণৈষণা, ধনৈষণা এবং পরলোকৈষণা নিয়ে 'তিস্রৈষণীয়ো' একাদশ অধ্যায়ের উপদেশাবলী। একটা উদাহরণ— 'ন মূঢ়ো লভতে সংজ্ঞাং তাবদ্যাবন্ন পীড়্যতে।' পীড়া কঠিন হয়ে না পড়লে মূঢ় ব্যক্তির চৈতন্য হয় না। ফলে সে জীবনত্যাগ করে। আর প্রাজ্ঞ ব্যক্তির রোগ হলে ত্রিবিধ ঔষধ— বাহ্যমার্জন, অভ্যন্তর মার্জন ও শস্ত্রকর্ম গ্রহণ করে তিনি শান্তিতে থাকেন।

এর পরের অধ্যায়ের 'বাতকলাকলীয়ঃ' অর্থাৎ বায়ু প্রসঙ্গে চুলচেরা বিবরণ জানতে মহর্ষিদের জিজ্ঞাসা, উত্তর— প্রত্যুত্তর অবশেষে ভগবান আত্রেয়ের উপদেশ— বাত-পিত্ত-শ্লেষ্মা অব্যাহত থাকলে পুরুষকে সবলেন্দ্রিয়, বলবর্ণসুখোপন্ন এবং দীর্ঘ জীবনসম্পন্ন করে।

পরের ৪টি অধ্যায়ে— 'অষ্টৌনিন্দিতীয়ঃ' (আট নিন্দনীয় পুরুষ— অতি স্থূল, অতিকৃশাদিদের রোগ ও তার ঔষধ; 'লঙ্ঘনবৃংহণীয়ঃ' (শরীরের লঘুতা লঙ্ঘন, স্থূলতাবৃংহণ, রুক্ষ্মতা-রুক্ষণ, স্নেহন ক্রিয়ায় স্নিগ্ধতা, স্বেদন ক্রিয়ায় ঘর্ম হয় এবং যথাযুক্ত স্নেহন ক্রিয়ায় স্নিগ্ধতা, স্বেদন ক্রিয়ায় ঘর্ম হয় এবং যথাযুক্ত স্তম্ভন হলে রোগের প্রতিকার হয়— এই ভাবে ৬ প্রকারের চিকিৎসা।); 'সন্তর্পণীয়ঃ' (সন্তর্পণ ও অপতর্পণ হতে উৎপন্ন রোগাদি তার ঔষধ) প্রসঙ্গ বিবৃত।

২৫তম 'যজ্জঃ পুরুষীয়' অধ্যায়ে রোগবৃদ্ধির কারণ, হিতকর ও অহিতকর আহার এবং মন, শরীর ও অস্থির বলাধানকারক ৮৪ প্রকার আসব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'আত্রেয়ভদ্রকাপীয়ঃ' আহার ও রস, দ্রব্য প্রকরণ (এখানে বলা হয়েছে 'জগতে এমন কোনো দ্রব্যই নাই, যাহা ঔষধ হইতে পারে না।') পঞ্চভূতাত্মক ৬ প্রকার রস এবং বিরুদ্ধ ভোজন জন্য ব্যাধিদিগের ঔষধ আত্রেয় মুনি বর্ণনা করেছেন। 'অন্নপানবিধিঃ' অধ্যায়ে ১২টি প্রধান আহারবর্গের কথা বলা হয়েছে। যেমন, শূকধান্যবর্গ, ফালিধান্য, মাংস, শাক, ফল, হরিত, মদ্য, অম্বু, গোরস (দুগ্ধঘৃতাদি), ইক্ষু, কৃতাহার (রান্নাকরা আহার। যেমন ভাত) এবং তৈলবর্গ। অন্ন ও পানীয়ের গুণ, গুরু ও লঘুত্বের বর্ণনার সঙ্গে বলা হয়েছে— 'যিনি সর্বদা আহিতাগ্নি হইয়া অন্তরাগ্নিতে পথ্যসমূহ আহুতি দেন, যিনি প্রতিদিন ব্রহ্মজপ করেন ও যথাসাধ্য দান করেন... সেই হিতভোজনসেবী পুরুষ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র রানি (১০০ বৎসর) অরোগী হইয়া জীবিত থাকেন।' (পৃঃ ২৬৭) 'বিবিধাশিত পীতীয়ঃ' আহার পরিপাক এবং বিপাকে রোগাদি ও তাদের ঔষধ এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে উপদেশ— 'পরীক্ষাপূর্বক হিতাহার করিবে, কারণ আহার হইতেই দেহ উৎপন্ন হয়।' (পৃ.-২৭৩)

সূত্রস্থানের শেষ দু'টি অধ্যায়— 'দশপ্রাণায়তনীয়ঃ' এব 'অর্থেদশমূলীয়ঃ'। বৈদ্যের গুণাগুণ ও সূচি বর্ণিত।

আলোচ্য 'চরক-সংহিতা, ১ম খণ্ডে' সূত্রস্থানের পরে আরও দুটি স্থান— নিদান ও বিমান প্রসঙ্গ বলা হয়েছে। নিদান-স্থানে ৮টি রোগের বিবরণ— জ্বর, রক্তপিত্ত, গুল্ম, প্রমেহ (মূত্ররোগ), কুষ্ঠ, শোষ (যক্ষ্মা), উন্মাদ এবং অপস্মার (মূর্ছা, মৃগী) এবং চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

বিমানস্থানম্। প্রথম অধ্যায় রসবিমান। ইংরেজিতে 'কেমিস্ট্রি' বলা যেতে পারে। বিমানের অর্থ রস, দ্রব্য, দোষ ও রোগের প্রভাব; পিপুল, ক্ষার ও লবণ অধিক পরিমাণে ভক্ষণ দোষসঞ্চয়কারী এবং ভোজন বিধি আলোচিত। 'ত্রিবিধকুক্ষীয়ম্' অধ্যায়ে বলা হয়েছে উদরের তিন ভাগের এক ভাগ অংশ কঠিন খাদ্যদ্বারা, দ্বিতীয় এক তৃতীয়াংশ লেহ্য-পেয় দ্বারা পূরণ করবে, শেষাংশ খালি রাখবে। পরের অধ্যায় 'জনপদোদ্ধংসনীয়' বা মহামারী প্রসঙ্গ, চতুর্থ অধ্যায়ে ত্রিবিধ রোগবিষয়ক বিজ্ঞান আলোচিত। ৫ম অধ্যায় 'স্রোতোবিমানম্'। রোগের প্রভাব, প্রকৃতি আদি নিয়ে 'রোগানীকবিমানং' অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ব্যথিত অর্থাৎ পীড়িতের রোগের গুরু-লঘুত্ব স্থির করতে জ্ঞানবিভ্রমে বৈদ্যের বিপত্তি প্রসঙ্গ এবং ক্রিমি রোগের বিস্তৃত বিবরণ ও চিকিৎসা নিয়ে ৭ম অধ্যায় 'ব্যাধিতরূপীয়ম্'-এ আলোচিত।

১৭৮টি শ্লোকবিশিষ্ট 'রোগ-ভিষগ্‌জিতীয়-বিমান' অধ্যায়ে সংক্ষেপে আয়ুর্বেদের দর্শন বর্ণিত। ভারতের সাংস্কৃতিক দর্শনের মর্মকথা— 'সর্বে সুখিনঃ সন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ ভবেৎ'। সকলের সুখ আর নিরাময়ে থাকার আকুতিতে পূর্ণ চরক সংহিতা। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে বৈদ্য ও রোগীদের প্রতি সাবধান বাণী ছড়িয়ে রয়েছে। এই অধ্যায়ে সূচি— আচার্য-শিষ্যের লক্ষণ, পরীক্ষণীয় বিষয়, কারণ, অধ্যেয় বিধি, অধ্যাপনা বিধি, সম্ভাষাবিধি ইত্যাদি। এর মধ্যে শিষ্যের প্রতি আচার্যের উপদেশের কয়েকটি হলো : '...তুমি পুত্রবৎ, দাসবৎ ও অর্থিবৎ আমার অনুসরণ করিবে।... তুমি অসূয়াবিহীন হইয়া আমার আজ্ঞা পালন করিবে, বিচলিত হইবে না। (৮/৯) সর্বপ্রাণীর মঙ্গলার্থে অহরহ সর্বান্তঃকরণে আতুরগণের আরোগ্যসাধনে যত্নবান হইবে। জীবিকার অনুরোধেও রোগীদিগের অতি-দহন করিবে না। মন দ্বারাও পরস্ত্রীগমন করিবে না। পরস্বও এইরূপে পরিহার করিবে। যে সকল স্ত্রীলোকের স্বামী বা অভিভাবক নিকটে নাই তাহাদেরও চিকিৎসা করিবে না। (৮/১০) অনুমতি লইয়া, সংবাদ দিয়া, পরিচ্ছন্ন হইয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবে। রোগীর মৃত্যু নিকট জানিয়াও বর্ণনা করিবে না, আত্মশ্লাঘা করিবে না।' (৮/১১)

'চরক সংহিতা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকেই পাঠকেরা বুঝতে পারবেন যে, গ্রন্থটি শুধুমাত্র বৈদ্যদের জন্য নয়, ধর্মার্থ-কামসিদ্ধির জন্য সকলেই পাঠ করে নিজের স্বাস্থ্যরক্ষা ও আনন্দ পাওয়াই নয়, প্রয়োজনে আর্তের সেবা করে পীড়িতের রোগমুক্তিও করতে পারেন। পুস্তকটির বহুল প্রচার কাম্য।

চরক সংহিতা (১ম খণ্ড) (সূত্রস্থান, নিদানস্থান, বিমানস্থান) বঙ্গানুবাদ : কবিরাজ যশোদানন্দন সরকার। সম্পাদনা : বৈদ্যাচার্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা, আয়ুর্বেদাচার্য সত্যশেখর ভট্টাচার্য। প্রকাশক : দীপায়ন, ২০, কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯। দাম : ২৫০ টাকা।

সমাবেশ সমাচার

ব্রহ্মপুত্র ও রঘুনাথগঞ্জে বজরং দলের শিবির

গত ১১ থেকে ১৩ অক্টোবর (২০১৪) বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব সংগঠন বজরং দলের বর্গ বহরমপুরস্থিত কাশিমবাজার লাধুরাম তোষনিওয়াল সরস্বতী শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো। ব্রহ্মপুর ও রঘুনাথগঞ্জ জেলার ৫৬ জন শিক্ষার্থী, ২৫ জন শিক্ষক প্রবন্ধক উপস্থিত ছিলেন। বর্গে স্বাগত ভাষণ রাখেন প্রান্তীয় সেবাপ্রমুখ ডাঃ কুশল কুণ্ডু। শিক্ষার্থীদের সামনে বৌদ্ধিক ও প্রবচন রাখেন পরিষদের প্রান্তীয় কার্যকর্তা উত্তম দাস ও অর্চন সাহা। বিশেষ করে উত্তম দাসের সুচিন্তিত বক্তব্য "চতুর্মুখী আক্রমণ" যুবকদের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করে। বর্গে ২৭টি গ্রাম থেকে শিক্ষার্থীরা আসেন। বর্গের মধ্যে ১ জন ইঞ্জিনিয়ার, ২৫ জন স্নাতক শ্রেণীর ১৮ জন উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক ছাত্র, ১২ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। সমারোপে শিক্ষার্থীরা শারীরিক প্রদর্শন করেন। বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের মহকুমা সঙ্ঘচালক ভূপতি সরকার ও পরিষদের সম্পাদক দীগেন মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন সুশোভন মুখোপাধ্যায় ও তারক সাহা। বর্গে আসেন বহরমপুর শহরের সম্মানীয় ব্যক্তি সুধাংশু বিশ্বাস। তিনি আমাদের বহু সামাজিক নিঃস্বার্থভাবে সহযোগিতা করেন।

আলিপুরদুয়ারে বঙ্গীয় শিক্ষক সঙ্ঘের সম্মেলন

গত ১৪ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ারে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. কমলকান্তি নন্দী। সম্মেলনে প্রারম্ভিক ভাষণ দেন সঙ্ঘের সভাপতি অবনীভূষণ মণ্ডল। বাংলার শিক্ষার অবক্ষয় ও তার প্রতিকার বিষয়ের উপরে ভাষণ দেন শিক্ষাবিদ সাধন কুমার পাল। স্কুলের সিলেবাস সংক্রান্ত বিষয়ের উপরে আলোচনা পরিচালনা করেন সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পাল। আলোচনায় অনেকে অংশ গ্রহণ করেন ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলনে দুইজন যুগ্ম আহ্বায়ক নিযুক্ত হন, মিন্টু কুণ্ডু, প্রদীপ পণ্ডিত। উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন সাধন কুমার পাল।

এই সম্মেলনে মাদারিহাট, কুমারগ্রাম, হাসিমারা, হ্যামিলটনগঞ্জ থেকে আগত শিক্ষকরা নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক সন্ত সম্মেলন

গত ১৬ আগস্ট ২০১৪ মুম্বাই-এর সন্দীপনী আশ্রমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় প্রন্যাসী সমিতি ও মার্গদর্শক মণ্ডলীর আহ্বানে পরিষদের ৫০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। বিগত ৫০ বছরে পরিষদের বহুমুখী কার্যের অগ্রগতি স্বরূপ শ্রীরাম পাদুকা পূজন, রামশীলা পূজন, রামজ্যোতি রথ, একাত্মতা যাত্রা, গঙ্গা সংরক্ষণ জাগরণ যাত্রা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। দক্ষিণবঙ্গ থেকে তিনজন সন্ত-প্রতিনিধি মুম্বাইতে অংশগ্রহণ করেন।

সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রস্তুতি হিসাবে গত ২১ অক্টোবর ২০১৪ আদ্যাপীঠ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে দক্ষিণবঙ্গ মার্গদর্শক মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় সন্ত প্রতিনিধি পূজ্যপাদ শ্রীমদ দেবানন্দ ব্রহ্মচারীজীর আহ্বানে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৫০ জন পূজ্য সন্তের উপস্থিতিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান ভারতবর্ষের জ্বলন্ত সমস্যা যেমন, অনুপ্রবেশ, লাভ জেহাদ, সন্ত্রাসবাদ, গো-হত্যা, ধর্মান্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর পূজ্য সন্তগণ বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

আগামী ২০ ডিসেম্বর কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে বেলা ১২ টায় বিশাল হিন্দু সম্মেলনে বিপুল সংখ্যায় যোগদানের জন্য পরিষদের কেন্দ্রীয় অধিকারী ওয়াই রাঘবলুজী বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। মুম্বাই সম্মেলনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী গুরুপদানন্দজী ও স্বামী বন্ধুগৌরব মহারাজ উপস্থিত ছিলেন।

জয়পুরে শিক্ষক মহাসঙ্ঘের সম্মেলন

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর, জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয় ছিল "উচ্চশিক্ষায় নিয়ামক বিধান সমূহ"। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় থেকে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, সহ-অধ্যাপক, গবেষক-সহ প্রায় ৭০০ জন উক্ত দুদিনব্যাপী সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া ভাষণ দেন। মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জগদীশ প্রসাদ সিংঘল, সর্বভারতীয় সম্পাদক অধ্যাপক মহেন্দ্র কাপুর, সভাপতি

হুগলী জেলার ডানকুনিতে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সভা।

অধ্যাপক বিমল প্রসাদ আগরওয়াল-সহ নেতৃবৃন্দ শিক্ষার সর্বভারতীয় চিত্র তুলে ধরেন। জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ তরফে সংগঠন সম্পাদক অজিত বিশ্বাস, অধ্যাপিকা পাপিয়া মিত্র, অধ্যাপক সমর সরকার ও অধ্যাপক ভাস্কর পুরকায়স্থ সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ১২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে জাতীয় স্তরে শিক্ষায় নিয়ামক সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। পাঁচটি সেখানে সায়ত্ত্বতা, সর্বজনীন ও ব্যক্তিগত পুঁজিতে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বাছাই করা ৪০টি সেমিনার পত্র 'মীমাংসা' নামক বইয়ে প্রকাশিত করা হয়। সেমিনারলব্ধ সর্বভারতীয় স্তরের চিন্তাবিদদের মতামত মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার, রাজস্থান সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

দুর্গাপুরে সেবা বিভাগের বিজয়া সম্মেলন

আর এস এসের সেবা বিভাগের পরিচালনায় প্রতি বছরের মতো এবছরও বিভিন্ন স্থানে বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শহর ও গ্রাম মিলিয়ে মোট ৬টি স্থানে সেবা প্রকল্পের ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের নিয়ে বেশ উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ বিজয়া সম্মেলন করা হয়। গ্রাম ও নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি উল্লেখনীয়।

বিজয়া সম্মেলনের মাধ্যমে অনেক নতুন ব্যক্তিত্বের সেবা কাজ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া ও কাজের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। দুর্গাপুর নগরের ২৩নং ওয়ার্ডের সেবা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের ডাক্তারবাবুকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বস্তিবাসীদের পক্ষ থেকে। সেবা সংস্থা বিবেকানন্দ বিকাশ পরিষদের বিজয়া অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে নগরে ও গ্রামে আরও সেবা প্রকল্প বৃদ্ধির সংকল্প নেওয়া হয়।

বিজয়া ও দীপাবলীর শুভেচ্ছা

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পাল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের শুভ বিজয়া দশমী ও দীপাবলী উপলক্ষে সবাইকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

বেহালায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বিজয়া সম্মেলন

স্বধর্মে প্রত্যাবর্তনের অঙ্গ হিসাবে বেহালায় হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পরিচালনায় গত ১২ অক্টোবর রবিবার সকাল ন'টায় বেহালা থানার বিপরীতে বাবা পঞ্চানন মন্দিরে বিজয়া সম্মিলনী ও সামূহিক পূজা পাঠ ও যজ্ঞের মাধ্যমে এক বর্ণময় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই উপলক্ষে ছয়টি স্বধর্মে পরিবর্তিত পরিবার ও একজন তাঁর দুই বছরের শিশুসহ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

পূজাপাঠ ও যজ্ঞাদি কার্যক্রমের পর উপস্থিত ভক্তবৃন্দ যজ্ঞে আহুতি প্রদান করেন। স্বধর্মে পরিবর্তিত পরিবারের সকলকে বস্ত্র দান করা হয়। পরিশেষে উপস্থিত সকল ভক্তবৃন্দকে দুপুরে প্রসাদ ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে দিলীপ ঘোষ, নিশীথ দত্ত, স্বরূপ দত্ত, ডাঃ বি. পি. সাহা ও মাননীয় সভাপতি সোমেন দাস উপস্থিত ছিলেন।

আদ্যাপীঠে অন্নদাঠাকুরের ১২৩তম জন্মদিবসে কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ।

ভারতীয় সিনেমায় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

রীনা চট্টোপাধ্যায় ॥ আজ থেকে একশ পাঁচ বছর আগে ১৯০৯ সালের ১২ জুলাই ভারতীয় সিনেমার অসাধারণ চিত্রপরিচালক ও ক্যামেরাম্যান বিমল রায়ের জন্ম হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশে। ভারতীয় সিনেমায় বিমল রায় এক নমস্য ব্যক্তিত্ব হিসেবেই চিহ্নিত থাকবেন। বিশেষ করে তাঁর ছবিতে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যাগুলি উঠে এসেছে।

১৯৩২ সালে কলকাতার নিউ থিয়েটার্সের সহকারী ক্যামেরাম্যান হিসেবেই তাঁর ভারতীয় সিনেমায় আত্মপ্রকাশ। ১৯৩৫ সালে বরেণ্য চিত্র পরিচালক তথা অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার সহকারী পরিচালক হিসেবে তিনি বাংলা সিনেমায় সর্বকালের সেরা 'দেবদাস' ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনা, চন্দ্রাবতী এবং কে. এল. সায়গল অভিনীত এই ছবিটি বাংলা সিনেমার মাইল স্টোন হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

১৯৪৪ সালে প্রথম স্বাধীন পরিচালক হিসেবে 'উদয়ের পথে' ছবিতে তাঁর সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলকাতার চিত্রা সিনেমায় রাধামোহন ভট্টাচার্য, বিনতা রায়, জ্যোতির্ময় রায় অভিনীত নিউ থিয়েটার্সের এই ছবিটি বাংলা সিনেমাজগতে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয়। অনুপ চৌধুরীর কাহিনীতে তৈরি 'উদয়ের পথে' ছবিতে সর্বহারা শ্রেণীর লড়াইয়ের ঘটনা তুলে ধরা হয়। ছবিটির সুরকার ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। এই ছবিতে তিনটি অসাধারণ রবীন্দ্র সঙ্গীত রাখা হয়েছিল, যা প্রায় স্বাধীনতা যুগের দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল।

উদয়ের পথে ছবিটির সাফল্যের পর আর বিমল রায়কে পিছনে তাকাতে হয়নি। এরপরই তাঁর বলিউড যাত্রা শুরু। ১৯৫০ সালে বিমল রায় মুম্বইয়ে চলে যান এবং ভিট্টরিও ডি সিকার 'বাই সাইকেল থিফস'র মতো ইতালিয়ান ছবি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯৫৩ সালে তৈরি করলেন 'দো বিঘা জমিন'। বলরাজ সাহনি, নিরুপা রায় অভিনীত সলিল চৌধুরীর সুরে এই ছবিটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি পায়। সাদা কালোয় তৈরি ছবিটি কানের ফিল্ম উৎসবে পুরস্কৃত হয়। এরপর বিমল রায় তৈরি করেন 'পরিণীতা' 'বিরাজ বউ' 'দেবদাস' 'মধুমতী' 'সুজাতা' 'বন্দিনী'র মতো একাধিক অসাধারণ ছবি, যা

পরিচালক বিমল রায়

ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। বিমল রায় তাঁর সিনেমা জীবনে এগারো বার ফিল্ম ফেয়ার পুরস্কার ও দু'বার জাতীয় পুরস্কার পান সেরা পরিচালক হিসেবে। বিমল রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলিতে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। হিন্দিতে তিনিই প্রথম 'দেবদাস' তৈরি করেন। এজন্য কলকাতা থেকে উড়িয়ে আনেন নিজের ভাগ্নে দিবানাথ সেনের স্ত্রী বাংলা সিনেমার মহানায়িকা সুচিত্রা সেনকে পার্বতীর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। দিলীপ কুমার, সুচিত্রা সেন ও বৈজয়ন্তীমালার অভিনয় সমৃদ্ধ ১৯৫৫ সালে মুক্তি পাওয়া 'দেবদাস' পঞ্চাশ-এর দশকে বলিউডের অন্যতম মাইল স্টোন হয়ে উঠেছিল। 'দেবদাস' ছবির প্রযোজক, পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান হিসেবে বিমল রায় ছবিটি উৎসর্গ করেন প্রমথেশ বড়ুয়া ও কুন্দনলাল সায়গলের নামে। ভারতীয় সিনেমা তথা বলিউডে 'দেবদাস' ছবিটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে শরৎচন্দ্র 'দেবদাস' লিখেছিলেন, যা ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয়। চন্দ্রমুখীর ভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালা, দেবদাসরূপী দিলীপ কুমার ও পার্বতী সুচিত্রা সেনকে সমানে টেক্কা দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দেবদাস' ছবির হিন্দি ভার্সনের সিনেমাটোগ্রাফি ও আলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন বিমল রায়ের সহযোগী কমল বসু।

পঞ্চাশের দশকের ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগে বিমল রায় ছিলেন এক শীর্ষ ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'দো বিঘা জমিন' ছবিটি বাণিজ্যিক সাফল্যও পেয়েছিল। বলিউডে প্যারালাল সিনেমা হিসেবে 'দো বিঘা জমিন'কে অবশ্যই সামনের সারিতে রাখা যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের দারুণ ভক্ত ছিলেন বিমল রায়। তাই বার বার প্রভাবিত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তৈরি করেছিলেন 'বিরাজ বউ'। 'বিরাজ বউ'তে কামিনী কৌশলের অবিস্মরণীয় অভিনয় আজও ভুলতে পারবেন না ভারতীয় দর্শকরা। একইভাবে শরৎচন্দ্রের কাহিনী 'পরিণীতা' ছবিতে মীনাকুমারী ও অশোককুমার অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন বিমল রায়ের পরিচালনায়। ভারতীয় সিনেমায় মীনাকুমারীর উত্তরণ ঘটেছিল বিমল রায়ের হাতেই। ভারতীয় সিনেমায় বিমল রায়ের অবিস্মরণীয় ভূমিকা আজও প্রভাব ফেলে নতুন চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে। ভারতীয় সিনেমায় প্যারালাল সিনেমার জনক হিসেবে বিমল রায়ের নাম তুলে ধরা যায়। ভারতীয় সিনেমায় বিমল রায় তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়টাই বলিউডে কাটালেও তাঁর পরিচালিত 'উদয়ের পথে' আজও টলিউডকে নাড়া দেয়। নিউ থিয়েটার্সে হাতে খড়ি বিমল রায় বাংলা 'দেবদাস' ছবিতে প্রমথেশ বড়ুয়া, কে এল সায়গলের মতো ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রমথেশ বড়ুয়া বিমল রায়ের ক্যামেরার কাজ ও সহকারী পরিচালনার দক্ষতায় মুগ্ধ ছিলেন। আজকের মতো আধুনিক প্রযুক্তিতে তখন সমৃদ্ধ ছিল না ভারতীয় সিনেমার প্রযুক্তি। ক্যামেরা, সাউন্ড রেকর্ডিং, আলো আজকের মতো সমৃদ্ধ ছিল না।

বিমল রায়ের অধিকাংশ হিন্দি ছবির সুরকার ছিলেন হয় সলিল চৌধুরী নয় শচীন দেববর্মন। বিমল রায়ের পছন্দের নেপথ্য শিল্পী ছিলেন অবশ্যই তালাত মাহমুদ। বিমল রায় যে ভারতীয় সিনেমার এক সেরা আইকন ছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

শব্দরূপ-৭২৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১		২	৩	■	৪	
৫		■	৬		■		■
৭		■	■		■		■
■		■	৮		৯		১০
১১		■	■	১২		■	
	■	১৩	■	■	■	■	■
■	১৪			১৫		■	১৬
■	■		■		■	■	

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** মৃতপ্রায়, **৪.** চতুর্বর্ণের চতুর্থ, **৫.** ফুলে রাক্ষস, **৬.** 'অসির চেয়ে—বড়, (প্রবচনে), **৭.** মূল্য, দাম, **৮.** নবাবী সরকারে খাস মুন্সী, যেমন শ্রীরূপ গোস্বামী ছিলেন নবাব হোসেনশার, **১১.** পাখি উলটে ফুল, **১২.** কানের নরম অংশ, **১৪.** বিষ্ণু।

উপর-নীচ : **১.** পারদগন্ধকঘটিত ঔষধবিশেষ; মদন, **২.** '—চিত্তে নিতি নৃত্যে' (রবীন্দ্রনাথ), **৩.** কোচবিহারের কাছে পাখিরালয়; পরিযায়ী পাখির জন্য পরিচিত, **৪.** রাবণ-ভগিনী, লক্ষ্মণ যার নাক কেটেছিলেন, **৫.** খারাপ, মন্দ, **৯.** মদনের পত্নী, **১০.** দক্ষকন্যা, ভগবতী, **১১.** অশ্ব, **১৩.** কর্ণাভরণ; বলয়, **১৫.** এটি টানলেই মাথা আসে, **১৬.** একই শব্দে বস্ত্র, গন্ধ, বাসস্থান।

সমাধান
শব্দরূপ-৭২২
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম

■	■	স	ত্য	ভা	মা	■	চাঁ
সু	দ	তী	■	■	দি	■	চ
■	র	■	যা	■	বা	ন	র
■	প	ন্ন	গ	■	■	ব	■
■	র	■	■	ভা	র	বি	■
সু	দা	মা	■	দ্র	■	ধা	■
ভ	■	উ	■	■	কা	ন	নে
দ্রা	■	ই	ল	বি	লা	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

❑ ৭২৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ ডিসেম্বর ২০১৪ সংখ্যায়

A
Well
Wisher
(21)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর, মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

।। চিত্রকথা।। বান্দাবৈরাগী।। ৬

A
Well
Wisher
(22)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

A
Well
Wisher
(23)

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
3 November - 2014

দাম : ১০.০০ টাকা